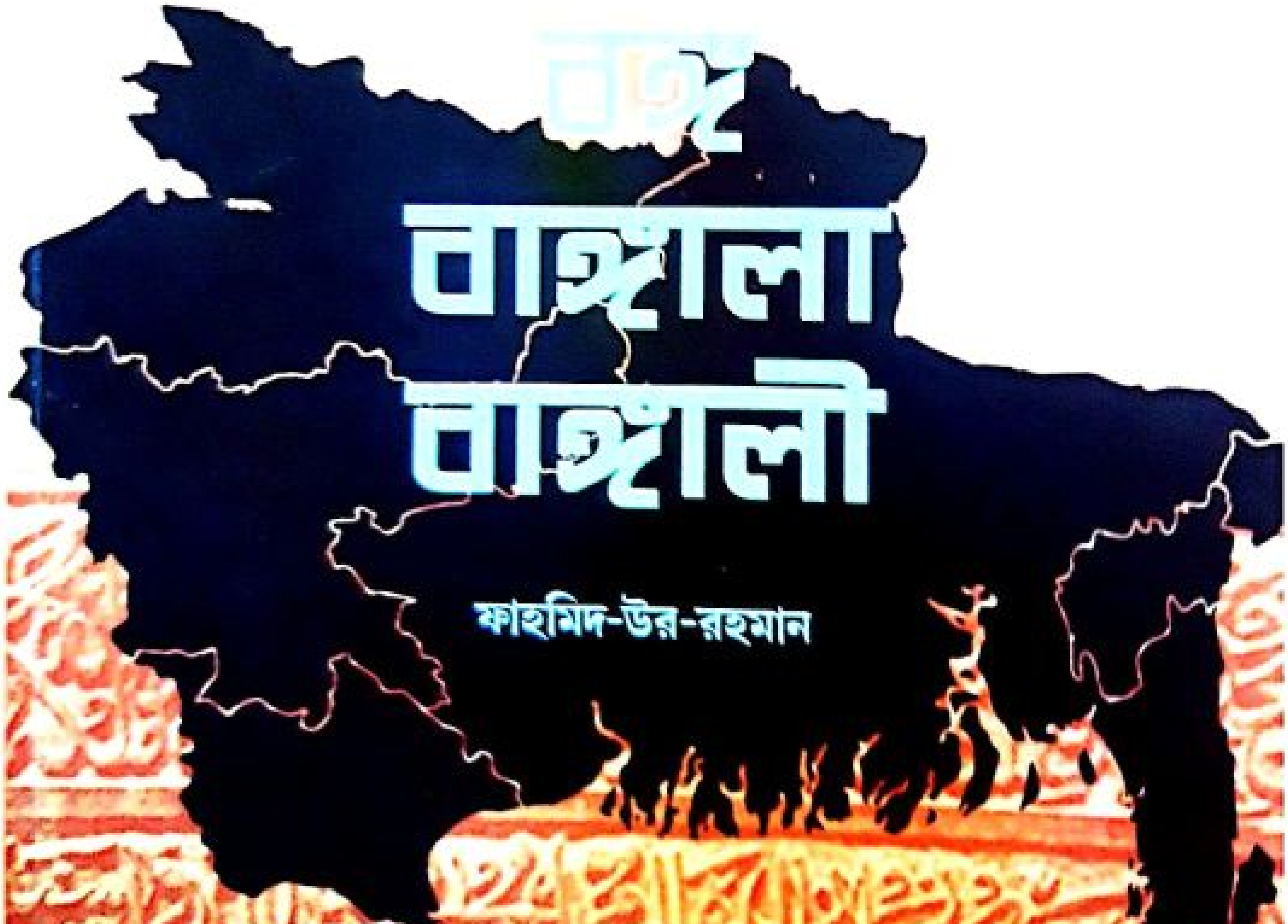
বঙ্গ
বাঙ্গালা
বাঙ্গালী
ফাহমিদ-উর-রহমান

# বঙ্গ
# বাঙ্গালা
# বাঙ্গালী

AnyScanner

# আমাদের কথা

সুদীর্ঘ ছয় শতাব্দীব্যাপী ন্যায়ভিত্তিকভাবে গোটা উপমহাদেশ পরিচালনাকারী ইসলামী সভ্যতার সাময়িক পতন পরবর্তী সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে আজ যখন আমরা আমাদের ইতিহাসের পাতা উল্টাতে যাই, অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, মুসলমানদের স্বর্ণালী সময়ের বয়ান গরহাজির। ব্রিটিশদের দুইশ বছরব্যাপী শোষণ, কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্য, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কমিউনিজমের ঢেউ, পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী অভিঘাতে এ অঞ্চলে মুসলমানদের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ের শিকড় যে অনেকাংশেই কর্তন হয়ে গেছে, তা আমাদের সামনে স্পষ্ট।

অথচ এ অঞ্চল তার সূচনা থেকে সমৃদ্ধির মধ্যগগন পর্যন্ত ইসলামকে তার পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে নিয়ে, তার ইমারতকে গড়ে তুলেছে পুরোপুরি ইসলামী ভাবধারায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা ও জ্ঞানগত ঋণগ্রস্ততার ফলে এ ইতিহাসের উজ্জ্বল বয়ান আজ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যা আমাদের পরিচয়ের মাত্রাকে নিয়ে গেছে টানাপোড়েন ও সন্দেহের দোলাচলে।

এ সময়েই ইতিহাসের খোলস সম্পূর্ণ বদলে ফেলে ইতিহাসের যে নতুন চর্চা শুরু হয়, সেখানে মৌলিক প্রশ্ন ওঠে, বাঙ্গালী ও মুসলমানিত্ব কি সাংঘর্ষিক? বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ কি আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি হতে পারে? সাংস্কৃতিকভাবে কি মুসলমানদের অবস্থানগত দুর্বলতা আছে? আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি যে ধর্ম হতে পারে তা কি নিতান্তই মধ্যযুগীয়

AnyScanner

ধারণা? মুসলিম আমলে বিকশিত সমৃদ্ধ ইতিহাস কি শুধুমাত্র কাল্পনিক রোমান্টিকতা নাকি অনিবার্য বাস্তবতা?

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী মননশীল লেখক, প্রাবন্ধিক ও চিন্তক ফাহমিদ-উর-রহমান তাঁর লেখায় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। একইসাথে বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক এবং ভাষিক ইতিহাসের উজ্জ্বল দিকগুলোর সংক্ষিপ্ত কিন্তু যৌক্তিক ও সুসংঘবদ্ধ পরিকাঠামো হাজির করেছেন এবং চর্চিত এ প্রশ্নগুলোর বিকল্প বয়ান হাজির করার চেষ্টা করেছেন।

এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হলো সময়ের প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক জবাব হাজির করার মাধ্যমে আমাদের ভিত্তিগত শক্তিশালী অবস্থান তৈরি, আবার বিকল্প প্রশ্ন রেখে চিন্তাশীল সমাজের সামনে বিশ্লেষণী প্রশ্ন হাজির করা, যা ইতিহাসের বাস্তবতাকে সময়ের নিরিখে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলবে।

সময়ের দ্বান্দ্বিকতার মোকাবেলায় নতুন বয়ানের প্রস্তাবনা দানকারী এ গ্রন্থ পাঠক মননে ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, ইনশাআল্লাহ।

AnyScanner

# কৈফিয়ত

এই লেখাটা ঠিক ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। ইতিহাসের খানিকটা পর্যালোচনা। এটাকে ঠিক রাজনীতির ইতিহাস না বলে সংস্কৃতির ইতিহাস বলা যেতে পারে।

বাঙ্গালী মুসলমানের জাতি হয়ে ওঠবার পর্বান্তরগুলো এখানে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব বিষয়ে অতীতে কেউ কেউ অবশ্যই লিখেছেন। কিন্তু হাল আমলে এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আমাদের মূলধারার আলোচনায় তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এর কারণ অবশ্যই মতাদর্শিকভাবে বিভক্ত আমাদের সামাজিক বাস্তবতা।

আমার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞতা নেই। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে আমার একটা আগ্রহের জায়গা আছে। এই আগ্রহের জায়গা থেকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। কতটা সফল হয়েছি, পাঠক তা বিচার করবেন।

পরিচয় প্রকাশনীর স্নেহাস্পদ সাবির গাজীর আগ্রহেই বইটা পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। সে ছাড়া এ বই হয়তো কালের ধুলির তলায় চাপা পড়ে থাকতো। তাকে মোবারকবাদ।

*ফাহমিদ-উর-রহমান*

৩ নভেম্বর, ২০২১

ঢাকা।

AnyScanner

A language is not just words. It's a culture, a tradition, a unification of community, a whole history that creates what community is. It's all embodied in a language.

—Noam Chomsky

AnyScanner

# বঙ্গ বাঙ্গালা বাঙ্গালী

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রয়োজনে আমরা এখন হাজার বছরের বাঙ্গালী শব্দটা প্রায়ঃশই শুনতে পাই। রাজনীতির প্রয়োজনে কখনো কখনো মিথকে ইতিহাসে পরিণত করা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এই শব্দটা আসলে এত পুরনো নয়। ভৌগোলিক কিংবা ভাষিক যে পরিচয়েই বাঙ্গালী শব্দটা আমরা ব্যবহার করি তার বয়স অবশ্যই হাজার বছরের কম। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, কোনো জনগোষ্ঠীর পরিচয় বিশিষ্ট হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। শব্দ হিসেবে বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী হয়তো অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। কিন্তু একটি ভৌগোলিক এলাকা বা এলাকার অধিবাসীদের পরিচয় জ্ঞাপক হয়ে উঠতে তা দীর্ঘ বিবর্তন ও প্রক্রিয়াকরণের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

প্রাচীন কালে আজকে যে ভৌগোলিক এলাকাকে আমরা বঙ্গ বা বাংলা বলে থাকি তা কোনো নির্দিষ্ট নামে পরিচিত ছিলো না। কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জাতি বা সেখানে কোনো দ্রব্যের নাম অনুসারে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছিলো। যেমন, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপি, দণ্ডভূক্তি, বঙ্গ, গঙ্গে, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

> এদের ছিল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের দাপট যেমন বেড়েছে এবং কমেছে, সঙ্গে জনপদের সীমানাও তেমনি বেড়েছে এবং কমেছে। এই সব জনপদ ঠিক কোথায় কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল তা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে যে সব উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের বিস্তার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আঁচ পাওয়া যায়।[১]

AnyScanner

মুসলমানরা আসার আগে তখন এই ভিন্ন ভিন্ন এলাকা এক অখণ্ড বঙ্গভূমিতে পরিণত হয়নি। সুতরাং সেই যুগে যারা বাস করতেন তারা কখনোই বাঙ্গালী নামে পরিচিত ছিলেন না। অন্যদিকে যে বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে বাঙ্গালী বা বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে তার জন্মকালটাও হিসাবের মধ্যে নেয়া জরুরী। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো নমুনা হিসেবে যে চর্যাপদের কথা বলা হয়ে থাকে তার বয়স পুরো এক হাজার বছর হয়েছে কিনা তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। তবে পণ্ডিতরা মনে করেন চর্যাপদকে ঠিক বাংলা ভাষা বলা যায় না। এর মধ্যে অন্য ভাষার উপাদানও আছে। এটি লেখা হয়েছিলো নেওয়ারী অক্ষরে।

বাংলা অক্ষরে লেখা প্রথম সাহিত্য কীর্তি বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন* ও শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইছুফ-জুলেখা*। এগুলো লেখা হয়েছিলো মুসলমান আমলে। চর্যাপদের বয়স এক হাজার বছর হয়ে থাকলে বাংলা ভাষার বয়স তার চেয়ে কম। সুতরাং বাংলা ভাষাকে বাঙ্গালীত্বের সবচেয়ে বড় উপাদান ধরলে বাঙ্গালীর ইতিহাসকে এক হাজার বছরের কম ধরতে হবে।

সেই দিক বিবেচনা করলে নীহার রঞ্জন রায় যাকে বাঙ্গালীর ইতিহাস[২] বলেছেন বা যে সময়কে তিনি বাঙ্গালীর ইতিহাস বলে দাবি করেছেন তাকে ইতিহাসের দিক দিয়ে যথার্থ বলা যায় না। কারণ তিনি যে সময়ের ইতিহাস লিখেছেন তখন এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা ছিলো না বা এই অঞ্চলের কোনো ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়নি।

একই যুক্তিতে বিশিষ্ট বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী গোলাম মুরশিদ *হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতি*[৩] নামের কিতাবে যে সময়ের আলোচনা করেছেন তা ইতিহাসের দিক দিয়ে হাজার বছরের অনেক কম সময়ের বলেই মনে করা সঙ্গত।

আবার বাঙ্গালী শব্দটার কোনো অখণ্ড রূপ নাই। এর মধ্যে ভাঙ্গনের একটি দিকও আছে। পুরো বাংলাভাষী অঞ্চল বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাভাষী মানুষেরা প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী। এই দুই ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে তফাৎ আছে। সংস্কৃতিরও আছে আলাদা রূপ। বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা নিয়েও মতান্তর আছে প্রচুর।

AnyScanner

উনিশ শতকে সেকালের শক্তিমান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বাঙালির উৎপত্তি* নামে যে প্রবন্ধটি[৪] লিখেছিলেন সেখানে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী বলতে আর্য হিন্দু থেকে উদ্ভূত বাংলাভাষীদের নাম সর্বাগ্রে রেখেছিলেন। মুসলমানরা যে বাঙ্গালী এ কথাটা তিনি সহজে মানতে পারেননি।

শক্তিমান কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বাংলাভাষী মুসলমানরা বাঙ্গালী কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ে ছিলেন। না হলে তার বিখ্যাত উপন্যাস *শ্রীকান্তে*[৫] বাঙ্গালী ও মুসলমান ছেলেদের ফুটবল ম্যাচের বর্ণনা ওভাবে দিতেন না।

বাংলা ভাষার পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখালেখি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়, বাঙ্গালী বলতে তিনি হিন্দু বাঙ্গালীকেই বুঝিয়েছেন। তার ভারত সংস্কৃতি বইতে তিনি যে ছবি এঁকেছেন তার ষোল আনাই হিন্দুয়ানী। এর মধ্যে মুসলমান ধর্মালম্বীদের আদৌ কোনো জায়গা নেই।

মুসলমান বাঙ্গালীদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন এর সংস্কৃতি নাকি হিন্দুয়ানী।[৬]

সুকুমার সেনের রচনা থেকেও অনুরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের এই পণ্ডিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মুসলমানদের জন্য যায়গা বরাদ্দ করেননি। *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* নামক কিতাব লিখে তিনি একটি পৃথক কোঠা বরাদ্দ করেছিলেন।[৭]

এই ধরণের বক্তব্যের পিছনের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষের ইতিহাসের সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি। বস্তুত: ভারতবর্ষের রাজনীতির জগতে দ্বিজাতিতত্ত্ব ঢুকবার আগে সংস্কৃতির জগতে তা অত্যন্ত মজবুতভাবে প্রবেশ করেছিলো।

## দুই

যতদূর জানা যায়, প্রাচীন কালে বাংলার আদি অধিবাসীরা ছিলো আদি অস্ত্রাল। আদি অস্ত্রালদের সাথে প্রথম যাদের সংমিশ্রণ ঘটে তারা হলো দ্রাবিড়। এদের সাথে মিশে ছিল মঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর ভোট চীনারা। এরপর আসে আর্যভাষীরা। এই ভিন্ন ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর রক্ত ও ভাষার মিশ্রণ

AnyScanner

ঘটেছিলো। আরও পরে মিশেছে সেমিটিক রক্ত। তারপর মধ্য এশিয়ার রক্ত। তাই আজকের বাংলাভাষীদের দেহে কোনো অবিমিশ্র রক্ত নেই। বিচিত্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জিন বাংলাভাষীদের শরীরে বহমান। সেদিক দিয়ে বাংলাভাষীদের একটি শঙ্কর জাতি গোষ্ঠী বলা যায়।

বাংলাদেশে আর্যভাষীরা আসে খ্রীষ্টের জন্মের আগে। বাংলাদেশ মৌর্যদের অধীনে এলে বর্ণাশ্রমবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলায় প্রবেশ করে। গুপ্ত আমলে উত্তর-পূর্ব বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালরাজারা বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেন-বর্মন রাজবংশ ছিলো পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্যবাদী। মূলতঃ এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল অনার্য। আর্যরা পরে এসে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। আর্য শব্দটার অর্থও হলো বিদেশি। এরা এশিয়া মাইনর থেকে ভারতে এসেছিলো। ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন সময় প্রচার করেছে ইসলাম হলো বিদেশির ধর্ম। কিন্তু তারাও যে বিদেশি ছিলো এ কথাটা অনেকে ভুলে যায়।

আর্যরা আদিবাসী অনার্যদের কখনোই সুনজরে দেখেনি, বরং আর্যভাষীরা যে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘৃণার চোখে দেখত সে কথা বেদে এবং পুরাণেই বর্ণিত আছে।[৮] হিন্দুদের ধর্মপুস্তক *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ বাংলার পুণ্ড্র জাতিকে দস্যু বলা হয়েছে। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ বঙ্গদেশের লোককে পক্ষীকল্প বলা হয়েছে। মহাভারতে বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের ম্লেচ্ছ এবং ভগবত পুরাণে কিরাত, যবন, খস ও সুহ্মগণকে পাপাশয় বলা হয়েছে।[৯]

অথচ এ অঞ্চলের লোকরা আদৌ দস্যু, বর্বর ও পাপী ছিলো না। এদেশের মানুষদের বিরুদ্ধে এটা ছিলো ব্রাহ্মণদের অপপ্রচার। ব্রাহ্মণরা তাদের জাতপাত নির্ভর চিন্তাভাবনা দিয়ে এদেশের মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইতো। এদেশের মানুষরা ব্রাহ্মণদের এই প্রকার কার্যকলাপ পছন্দ করেনি। সেই 'অপরাধে'ই ব্রাহ্মণরা এদেশের মানুষের চরিত্র হননে নেমেছিল। এদেশের মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের এই ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা ইতিহাসের পর্ব থেকে পর্বান্তর পেরিয়ে আজ অবধি প্রবাহমান আছে।

AnyScanner

এদেশের মানুষের প্রতি ব্রাহ্মণদের বৈরীতার একটা নমুনা পাওয়া যায়, দেখা যায় নিচের এই শ্লোকে

> অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি
> ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ।।

অর্থাৎ রামায়ণ এবং অষ্টাদশ পুরাণের কথা কেউ ভাষায় … সাধারণ মানুষের অসংস্কৃত স্থানীয় ভাষায় শুনলে রৌরব নরকে যেতে হবে। ব্রাহ্মণদের আচরণ নির্ভর সাহিত্যিকরা কত ব্যাপক হারে সক্রিয় যে, তারা এই ধরনের ফতোয়া জারী করেছিল।

ব্রাহ্মণরা প্রাচীন কাল থেকেই আজকের বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গ বলতো। এটি তারা বাঙালী অর্থে বলতো না, বলতো পাপ গর্হিত অর্থে, ম্লেচ্ছ যবন অর্থে। হাল আমলে প্রাচীন সূত্রের উপর নির্ভরশীল হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিশাল অভিধান বঙ্গীয় শব্দকোষ এ 'বাঙাল' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী অথবা পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান। অন্যদিকে বাঙালরা পশ্চিম বাংলার লোকদের, যেটা মোটামুটি গৌড় বা হিসেবে পরিচিত ছিল, বলতো ঘটি।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিও একবার ঢাকাবাসীর দেয়া সম্বর্ধনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

> আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোনো ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি, এই ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ঘরে ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমনই বলবৎ হয়, অমনি আর্শিতে মুখ দেখি, আরও, আমি শুদ্ধ বাঙালী নহি। আমি বাঙাল, আমার বাটি যশোহর।...."

এখানে মাইকেল নিজেকে বাঙাল হিসেবে দাবি করেছেন।

ত্রিপুরার দীনেশচন্দ্র সেন 'বাঙাল' হওয়ার অপরাধে কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে দরখাস্ত করে চাকরি পাননি। একথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—

*তাই তো, তুই যে বাঙ্গাল। এখানকার ছাত্তেরা তোর টিপরা জেলার ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয় যে, তুই অনার্স পাশ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবে। তোকে তো একদিন পাগল করিয়া ছাড়িবে।*[১১]

আরেক 'বাঙ্গাল' কোরআন শরীফের প্রথম বাংলা তরজমাকারী ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে তো কলকাতার বাবুদের মুখে নানা রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবমাননা হজম করতে হয়েছে।

বাঙ্গালের রক্ত শরীরে থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গাল স্ত্রী মৃণালিণীকে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে শাহজাদপুর (পাবনা) থেকে ভব্যতা বর্জিত ভাষায় একবার চিঠি লিখেছিলেন, 'একেই তো বলে বাঙ্গাল। ছি, ছি, ছেলেটাকে পর্যন্ত বাঙ্গাল করে তুললে গো।'[১২]

পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব হিন্দু গিয়েছেন, তারা এখন সেদেশে যথেষ্ট আদৃত নন। ঘটি ও বাঙালের মধ্যে একটা তফাৎ থেকেই গিয়েছে।

সুকুমার রায় জন্মসূত্রে ছিলেন পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জের লোক। কিন্তু তিনি তার একটি বিখ্যাত ছড়ায় বলেছেন–

বাঙাল মনুষ্য নহে
উড়ে এক জন্তু
লাফ দিয়ে গাছে ওঠে
লেজ নিয়ে কিন্তু।

বাঙ্গালদের পশ্চিমবঙ্গে ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করা হতো না। বিশেষ করে কলকাতা শহরে তারা ছিলেন অপাংক্তেয়। এই ঘটি ও বাঙাল শব্দ দুটি স্রেফ আঞ্চলিক বৈরিতার প্রতীক নয়। এটি বাংলার ভিতরেই দুই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক তফাৎ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণও বটে।

*তিন*

আজকে যে এলাকার মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে সেই অঞ্চল কখন থেকে বঙ্গ বা বাংলা হয়ে উঠলো তা একটু দেখা যাক। সাতশ বছর আগেও এই এলাকা রাজনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক অর্থেও ঐক্যবদ্ধ ছিলো না। মুসলমান শাসনামলে বঙ্গ একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা হয়ে

AnyScanner

ছিলো। প্রাচীন আমলে পৃথক বঙ্গের ধারণা বলে কিছু ছিলো না। অথচ বাংলায় মুসলমান শাসনের আগে এ এলাকার রাজনৈতিক মানচিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন নরগোষ্ঠী এসব রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে গোলযোগে। আজকে যে আমরা বঙ্গ, বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাদেশ বলে থাকি এগুলো সেকালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে অবস্থিত ছিল। অথচ আলি খান লিখেছেন

> প্রাচীন কালের বঙ্গ ক্ষুদ্র বাংলা নিয়ে মুসলমান শাসকরা গড়ে তোলে বৃহৎ বঙ্গ।"

মুসলমানরা আসার আগে রাজা শশাঙ্ক (৭ম শতাব্দী) ও পালরাজা (৭৫০-১১৬৬) বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। ফলে পূর্বে মুসলমানরা ছাড়া কেউ বাংলার কোনো টেকসই রাজনৈতিক ঐক্য তৈরি করতে পারেনি। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) শুধু বাংলার বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করেননি, তিনি এই ঐক্যবদ্ধ রাজ্যকে বাঙ্গালা হিসাবে নামকরণ করেছিলেন। তিনি নিজে শাহ ই-বাঙ্গাল খেতাব ধারণ করেন। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপার ঘটলেও শেষ পর্যন্ত এই ঐক্য চতুর্দশ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। মোগলরা বাংলাকে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করলে এটির নামকরণ হয় সুবা-ই-বাঙ্গালাহ এবং এসময় এই রাজনৈতিক ঐক্যের ধারা আরও শক্তিশালী হয়। মুসলমান শাসকদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ঐক্যের পথ ধরে এই অঞ্চলে একটি ভাষাগত সমরূপতা সৃষ্টির পথ সুগম হয়। বাংলার মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দরদী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর পূর্ববর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসকরা এরকম ছিলেন না। ব্রাহ্মণরা বাংলা তথা দেশি ভাষাকে অবজ্ঞা করতো। নিম্নশ্রেণির লোকজনের জন্য তারা সংস্কৃত ভাষা নিষিদ্ধ করেছিলো। যদিও এই ভাষাই ছিল সেকালের রাষ্ট্রভাষা, একই সাথে ধর্মের ভাষাও।

ব্রিটিশরা এসে এই ঐক্যবদ্ধ বাংলাকে সংহত করেছে এবং একে কেন্দ্র করেই তারা উপমহাদেশ জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে সময়ের প্রয়োজন। ইতিহাসের নানা ঘাত প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এই ঐক্য সাধন হয়। প্রাচীন কালের বঙ্গ থেকে আজকের আধুনিক বাংলাদেশে আসতে যেমন

সময় লেগেছে তেমনি এ অঞ্চলের মানুষকে নানা রাজনৈতিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছতে হয়েছে।

প্রাচীন কালে বঙ্গ বলতে যেমন বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ বুঝাতো, তেমনি গৌড় বলতে আজকের পশ্চিম বঙ্গ বুঝাতো। কখনো কখনো এ শব্দ দুটো পরস্পরের অর্থকেও গ্রাস করতো। যেমন কখনো কখনো গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাকে বুঝাতো। মাইকেল মধুসূদন শব্দটিকে এ অর্থে ব্যবহার করেছেন–

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি।[১৫]

বাংলাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এককেন্দ্রিক অঞ্চল হিসাবে প্রথম দেখার চেষ্টা করেন মোঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল। তিনি শুধু বাংলা শব্দটা ব্যবহার করেননি, এর উৎপত্তি নিয়েও চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এই মোঘল ঐতিহাসিক লিখেছেন–

*বাংলার আদি নাম ছিল বাং। এর পূর্বতন শাসকগণ সারা প্রদেশের ১০ গজ উঁচ ও ২০ গজ প্রস্থের মাটির ঢিবি তৈরি করেছিল; তাকে বলা হত আল। বাং এর সাথে আল প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাঙালা নাম গড়ে উঠেছে এবং প্রচলিত হয়েছে।*[১৬]

ভাষা বিজ্ঞানীদের ধারণা বঙ্গ শব্দটি এসেছে তিব্বতী শব্দ 'বঙস' থেকে। বঙস মানে ভেজা ও আদ্র দেশ।[১৭] আক্ষরিক অর্থের মতো বাংলাদেশ প্রকৃতই একটি আদ্র ও ভেজা দেশ।

আরেক ধারণা মতে, বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি আসামের বোড়ো উপজাতিদের শব্দ বাং ও লা থেকে, যার মানে দাঁড়ায় বিস্তীর্ণ সমতল।[১৮] হিন্দুদের কিংবদন্তি অনুসারে রাজকুমার বঙ্গ প্রথম বাংলা জয় করেছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল বালী রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণা ও অভিশপ্ত মুনি দীর্ঘতমার অবৈধ মিলনে।[১৯]

পৌরানিক এ গল্পটি বেশ জনপ্রিয়। কারণ হচ্ছে হিন্দু লিখিয়েদের অবিরাম প্রচার-প্রচারণা। এ গল্প অনুসারে এখানকার অধিবাসীরা আর্য রক্ত বহন করেছে এবং তারা দীর্ঘতমা ঋষির ক্ষেত্রজ সন্তান। এদেশের মানুষের চরিত্র হরণ করবার জন্যই আর্যরা এ গল্প ফেঁদেছিল।

AnyScanner

যাই হোক, বঙ্গ শব্দটার রাজনৈতিক তাৎপর্য মুসলমান আমলের অর্জন, যদিও তারা প্রথম বঙ্গ অঞ্চল দখল করেননি। বখতিয়ার খিলজী যখন জয় করেছিলেন গৌড়। তার রাজধানী ছিলো লক্ষণ সেনের নামানুসারে লক্ষণাবতী। বখতিয়ার খিলজী যে মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন তাতে সংস্কৃতিতে লিখেছিলেন 'গৌড় বিজয়'।

দেশ অর্থে বঙ্গ-এর পরবর্তী নাম হয় বঙ্গালা বা বাঙ্গালা। ফার্সিতে বাঙ্গালাহ। মরক্কোর বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাঙ্গালা নামের উল্লেখ আছে। তখন বাংলার রাজধানী ছিলো সোনারগাঁও। শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান ফখরুদ্দিন। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিলো এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হতো।

সুলতানী আমলের বাঙ্গালাহকে মোঘল আমলে দেখি সুবা-ই-বাঙ্গালাহ হিসেবে। মোঘল আমলে বাঙ্গালা নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের কাছে এই জনপদ বেঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী মনো এল-দা-আস্ সুম্নসাঁও লিসবন থেকে বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ অভিধান প্রকাশ করেন তার নাম দেন *ভোকাবোলারিও এম ইডিয়মা বেঙ্গলাই পর্তুগুয়েজ*। পর্তুগীজদের নামকরণকৃত এই অঞ্চল ইংরেজ শাসনামলে বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়।

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কর্মচারী হ্যালহেড বাংলা ভাষায় যে ব্যাকরণ প্রকাশ করেন তার নাম দেন *দি গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ*। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের আগ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের সরকারি নাম ছিলো বেঙ্গল। বিভাগোত্তর কালে বেঙ্গলের পূর্বাঞ্চল পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকে বঙ্গ বা বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাদেশকে বুঝাতো। যেমন–

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।[২০]

এখানে বঙ্গ বলতে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকেই বুঝাচ্ছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ অর্থে বঙ্গ শব্দের ব্যবহার তখনও উঠে যায়নি। যেমন একই

অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।[২১] (শর্মিষ্ঠা)

তবে বর্তমানে পূর্ববঙ্গ অর্থে বঙ্গের ব্যবহার কম। কিন্তু বঙ্গ বা বাংলাদেশ শব্দটার মধ্যে ভাঙনের যে লক্ষণ দেখি তাতো কমেনি। বঙ্গ এখন রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ও দুটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সাংস্কৃতিকভাবেও কি তারা এক? তাদের ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মনোগঠন, ঐক্যের বোধ, জাতীয়তাবাদ হুবহু এক নয় মোটেই। ভাঙ্গনই বঙ্গের অপরিহার্য তকদীর – নিয়তি? এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসগত পরিণাম।

*চার*

দেশ অর্থে বাঙ্গালী হয়ে উঠবার ইতিহাসের বিপরীতে বাংলা ভাষা অর্থে বাঙ্গালী হয়ে উঠবার ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। বাংলার ভৌগোলিক সত্তাটা যত পুরনো, বাংলা ভাষা ততটা নয়। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। এই চর্যাপদের জন্ম সূত্র ধরেই হাজার বছরের বাঙ্গালী শব্দটার ব্যবহার হয়। কিন্তু চর্যাপদে বাংলা ভাষার কিছু উপকরণ আছে। তাই বলে এটি বাংলা ভাষা নয়। এর মধ্যে অন্য ভাষার উপকরণও আছে। অহমীয়া, উড়িয়া মৈথিলী ও হিন্দিভাষীরাও এটাকে তাদের ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করে। কারণ এসব ভাষার মূল এক অর্থাৎ অপভ্রংশ। এর আগের স্তরের নাম হচ্ছে প্রাকৃত। উপরোক্ত সবগুলো ভাষার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শব্দগত ও ব্যাকরণগত কিছু কিছু মিল চর্যাপদে দেখা যায়।

বাংলা অক্ষরে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে মুসলমান আমলে। কিন্তু সেই কালেও বাংলা ভাষার নাম বাংলা হয়নি। একে তখন বলা হতো দেশি ভাষা। মুসলমান আমলে বাংলা ভাষা নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি গর্ব করেছেন তার নাম আবদুল হাকিম। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে পছন্দ করে না তিনি তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আবদুল হাকিমও তখন বাংলা ভাষাকে বলেছেন দেশি ভাষা–

দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।

AnyScanner

অষ্টাদশ শতকের শক্তিমান কবি ভারতচন্দ্রও দেশ অর্থে বাঙ্গালা ও বাঙ্গ… শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভাষা অর্থে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালী শব্দটি ব্যবহা… করেননি। ভারতচন্দ্র কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভাষায় প্রচুর যবন… উপাদান অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দও গ্রহণ করেছেন। তার নিজের লেখ…

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।

দেখা যাচ্ছে, আবদুল হাকিম ও ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালীত্বের ধারণা… দেশভিত্তিক, ভাষা ভিত্তিক নয়।

ভাষাকে ভিত্তি করে বাঙ্গালী পরিচয় ঔপনিবেশিক নির্মাণ। প্রথমে পর্তুগীজ পাদ্রী আস সুমুসাঁও, পরে ইংরেজ নাথানিয়েল হ্যালহেড বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখে বাংলা অর্থে বাঙ্গালীর ধারণাটা প্রচার করেন। পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে যখন বাংলা বই লেখা হতে থাকে অথবা শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বই বের হতে থাকে তখনই ভাষা বুঝাতে বাঙ্গালা এবং ভাষা অর্থে বাঙ্গালী শব্দটা একটা বিশেষ অর্থ নিতে থাকে।

উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে, ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রশ্রয়ে যে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জগৎ গড়ে ওঠে সেখানে বাঙ্গালী শব্দটা কিন্তু সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। এটা সকল বাংলা ভাষাভাষীকে কিন্তু মেলাতে পারেনি। তখন বাঙ্গালী বলতে শুধু বাঙ্গালী হিন্দুকে বুঝানো হতো, বাঙ্গালী মুসলমানকে নয়। এভাবে বাঙ্গালী শব্দটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বাঙ্গালী-হিন্দুরা আত্মসাত করে। ভাষা এখানে মেলায়নি, পৃথক করেছে। বাঙ্গালী শব্দটার এই ভঙ্গুর দিকটি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন–

> *বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিলো না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙ্গালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।*[22]

অনেকে বলে থাকেন, বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক হওয়া উচিত। কিন্তু ঐক্যের বোধ ছাড়া বাংলা … বাংলা

বললেই যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা যাবে, তার নিশ্চয়তা কৈ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথতো বাংলা ভাষা ভাষীদের ঐক্যের জন্য রাখীবন্ধন করেছিলেন। কিন্তু তার সে আহ্বানও কাজে লাগেনি। কারণ ভাষাতেও ধর্মের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠেছিলো। ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই। এটাও বাস্তবতা।

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদ[২৩] কিতাবের প্রথম পরিচ্ছদে ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে লিখেছেন, ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি বিহারে ধরা পড়েছিলেন তাদের ভাষার কারণে। কারণ ভাষার কারণে বিহারি অধ্যুষিত এলাকায় পরিচয় জানা-জানি হয়ে গিয়েছিলো। সিরাজের দৃষ্টিতে তাই ভাষা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিচয়। ভাষা অবশ্যই একটা শক্তিশালী পরিচয়, কিন্তু একমাত্র পরিচয় নয়। ক্ষুদিরাম বসু কিংবা প্রফুল্ল চাকি সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। সেই ত্যাগ কিন্তু তারা বাংলা ভাষার জন্য বা বাংলা ভাষাভিত্তিক কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীকার করেননি। তারা জীবন দিয়েছিলেন একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

সুতরাং বাংলাদেশের বেড়ে ওঠার ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে দেখা চাই, কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আয়নায় নয়। ভাষার মধ্যে যেমন ধর্মের প্রভাব আছে, তেমনি আছে স্থানের প্রভাব, সংস্কৃতির প্রভাব, বিত্তের প্রভাব। অনেক বাঙ্গালী ইংরেজিতে অভ্যস্ত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেকে শুদ্ধ বাংলা জানে না। আমরা শুদ্ধ বাংলার নমুনা নিয়েছি ঔপনিবেশিক কলকাতায় গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্য থেকে। সেই শুদ্ধ বাংলা অনেকেই জানে না। বরং এদের সংখ্যাই অধিক। সাধু চলিতে তফাৎ আছে। ভাষার মধ্যে উপভাষাও আছে। সিলেটের বাংলা, চাটগাঁর বাংলা আর যশোর-কুষ্টিয়ার কথ্য বাংলা এক নয়। দুজন সিলেটি বা চাটগাঁইয়ার বাতচিত অন্য জেলার লোকদের জন্য বুঝা কষ্টকর বৈকি। একই কথা খাটে পুরানো ঢাকার কুট্টিদের কথ্য জবান নিয়ে।

তাই ভাষার ভিত্তিতে এ দেশে যে ঐক্যের কথা বলা হয় তাও অনেকটা কৃত্রিম। বাংলাদেশ বহুভাবে নিজেকে ভেঙ্গেছে, গড়েছে। ইতিহাসে দেখি হিন্দুতে-বৌদ্ধতে, হিন্দুতে-মুসলমানে সঙ্ঘাত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ বিষয়ক ভাবনা বদল হয়েছে। মধ্যযুগে ধর্মই ছিল জাতীয়তাবাদের প্রধান

AnyScanner

মাপকাঠি। ইংরেজ আসার সূত্রে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণা পেয়েছি। তাই বলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ পিছু হটেনি। বাংলাদেশ এই জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া-পরিণাম, বাংলাদেশ দু-দুটি বিচ্ছিন্নতার ফসল। তারপরেও তার জাতিসত্তা বিষয়ক সংকটের সমাধান হয়নি। এ জন্যই একজন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যথার্থ বলেছেন, বাংলাদেশ স্ববিরোধিতার চ্যালেঞ্জে ভরা একটি দেশ।[২৪]

মোঘলরা বাংলাদেশ শাসন করতে এসে এই জনপদকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এসব পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্রাট বাবর উল্লেখ করেছেন–

> *বাংলায় একটি অনন্য প্রথা রয়েছে: সেখানে রাজত্বের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের প্রথা নেই বললেই চলে। রাজাকে খুন করে নিজেকে সিংহাসনে আসীন করতে পারলে যে-কেউ সাথে সাথেই রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পায়: আমির-ওমরাহ, সৈন্য এবং কৃষককুল কালবিলম্ব না করে তাকে মান্য করতে শুরু করে এবং তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পূর্বতন রাজাকে তারা যেমন সার্বভৌম রাজা বলে গণ্য করতো, একইভাবে নতুন রাজাকেও সমভাবে মান্য করে প্রশ্নাতীতভাবে তার আদেশ পালন করতো। বাংলার জনসাধারণ বলে যে, আমরা সিংহাসনের প্রতি বিশ্বস্ত; সিংহাসন যিনি দখল করে থাকেন, আমরা তারই বাধ্য, তারই প্রতি আমরা অনুগত।*[২৫]

মোঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলাকে বুলঘাকখানা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘর বলে বর্ণনা করেছেন। এই অঞ্চলের সতত বিভক্তির কারণ হিসেবে তিনি জনসাধারণের উপর আবহাওয়ার খারাপ প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন।[২৬]

সম্রাট হুমায়ুন অবশ্য বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ হয়ে গৌড়ের নাম দিয়েছিলেন জান্নাতাবাদ। গৌড় দখল করে তিনি নাকি এক মাস হেরেম থেকে বের হননি।[২৭]

আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এসে যমুনার জোয়ার ভাটা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, এদেশের মানুষের মন ও বিশ্বাস জোয়ার ভাটার মতো উঠা নামা করে

সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহ নিয়ামতউল্লাহ ফিরোজপুরি লিখেছেন–

> বাংলা হচ্ছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বেদনাকুল দেশ,
> কালবিলম্ব না করে যাও, মৃতদের কাছে দোয়া চাও।
> মাটিতে, পানিতে কোথাও শান্তি নেই, নেই স্বস্তি।
> আছে শুধু বাঘের থাবা আর কুমিরের হাঁ।[২৮]

উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সমর্থক মেকলেও ঝাঁঝালো ভাষায় বাংলাদেশের মানুষকে আক্রমণ করেছেন–

> *মেষের যেমন শিং আছে, মৌমাছির আছে হুল, গ্রীক-সঙ্গীতে ব্যক্ত যেমন মেয়েদের সৌন্দর্য তেমনি বাঙালীর আছে প্রতারণা। বড় বড় প্রতিশ্রুতি, মধুভাষী ওজর, বিশদ মিথ্যের বিস্তৃত মালা, ছল-চাতুরি মিথ্যে হলফ, জালিয়াতি–এই সবই হচ্ছে নিম্ন গঙ্গার লোকদের আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র।*[২৯]

এসব মন্তব্য নিয়ে মতান্তর থাকাই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশকে দেখতে হবে, বাংলাদেশের মতো করেই।

*পাঁচ*

মুসলমান আমলের আগে যেমন অখণ্ড বঙ্গদেশ গড়ে ওঠেনি, তেমনি সত্যিকার অর্থে বাংলাভাষাও বিকাশ লাভ করেনি। আর এ অঞ্চলের মানুষ বাঙ্গালী বলে পরিচিত হয়েছে তো আরও পরে। সুতরাং বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি ও সূচনা কাল হিসেবে ধরতে হবে মধ্য যুগের স্বাধীন সুলতানদের সময়কালকে। অথচ কাছাকাছি এই সময়টাকে সুকুমার সেনের মতো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। কথাটার মধ্যে বাস্তবতা যতটুকু তার চেয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার জের অনেক বেশি। মুসলমানরা এদেশে আসার পর যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হলো, তা স্থিতিশীল হতে কিছুটা সময় লেগেছে। এই অল্প পরিসর সময় রেখার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের নমুনা তেমন একটা নেই। কিন্তু তারপর তো মুসলমান শাসকরাই ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আম জনগণের ভাষা বাংলার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে গভীর মন দেয়। এক্ষেত্রে তাদের আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। মুসলমানরা আসার আগে প্রায় দুশো বছর বাংলা শাসন

AnyScanner

করেছিলো আর্য হিন্দুরা। এদের রাজভাষা ছিলো সংস্কৃতি। এই ভাষা সাহিত্য চর্চা করতে তারা উৎসাহিত করতেন। আম জনগণের ভাষার প্রতি ছিলো তাদের ক্রোধ। তারা এ ভাষাকে উৎখাত করতে চেয়েছিলো এবং এ ভাষা চর্চাকারীদের তারা নরকে পাঠানোরও হুমকি দিয়েছিলো।

শহীদুল্লাহ লিখেছেন–

> *আমরা হিন্দু-কালের কোনো বাংলা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেন রাজগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণের ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন।*

এনামুল হকের মতামতও একই রকম–

> *বাংলার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তাহার সভায় ধোয়ী, উমাপতি ধর, প্রভৃতি কবি এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাঁহার রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা ভাষা চর্চার কোনো আয়োজন তথায় ছিল না।*

এনামুল হকের আরেকটি মন্তব্য–

> *১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী বীর ইখতিয়ার বিন মুহম্মদ বখতিয়ার লক্ষ্ম সেনকে লক্ষণাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।*[৩১]

বাংলার সেন শাসনকে তাই বাংলা বান্ধব বলা যায় না কখনোই। সেনদের আগে বাংলার শাসক ছিলেন বৌদ্ধরা। এরা ছিলেন ভূমিপুত্র ও উদার প্রকৃতির। এদের সময়েই চর্যাপদ লেখা হয়। সেনরা ছিলো বহিরাগত। এরা এসে ছিলো কর্ণাটক থেকে। পাল আমলের শেষ দিকে তাদের প্রশাসনে সেনরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এরা এক সময় পালদের উৎখাত করে। সেনরা ছিলো ব্রাহ্মণ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক। এরা দেশে বর্ণপ্রথা, শ্রেণি বিভেদ চালু করে। তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনে নাভিশ্বাস ওঠে জনগণের। সেনরা বৌদ্ধদের নির্মূল করার চেষ্টা করে। বৌদ্ধরা জীবননাশের মুখে আরাকান, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই আমল নিয়ে সুকুমার সেনরা অবশ্য বিশেষ কিছু লেখেননি।

AnyScanner

এদেশে ইসলাম আসার ফলে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে একধরনের সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়েছিলো সন্দেহ নেই। ইসলাম না এলে এ দেশের সাহিত্য ধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসতো না। এ পরিবর্তনের ধাক্কা যেমন হিন্দুদের সাহিত্যে লেগেছে তেমনি মুসলমানদের সাহিত্যেও লেগেছে। যে দেশের সাধারণ মানুষের ভাষা উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছে ছিলো অবহেলিত, ইসলামের আগমনেই তা বাদশাদের দরবারে ঠাঁই পেলো। নসরত শাহ, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর নাম কোন বাঙালী ভুলে যেতে পারে। মুসলমান সুলতানদের দরাজ হাতে সাহায্য সহযোগিতার কারণেই সেদিন হিন্দু রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ করেছেন। মুসলমানরা জঙ্গনামা, কাসাসুল আম্বিয়া লিখেছে। হিন্দুরা লিখেছে পদাবলী, মুসলমানরা লিখেছে মারফতি গান, হিন্দুরা বিদ্যা সুন্দর লিখেছে, মুসলমানরা পদ্মাবতী রচনা করেছে।

মুসলমান শাসক মানে পাঠান, তুর্কী, কেউ কেউ আরবও ছিলো। এরা কিন্তু স্থানীয় লোক হয়ে গিয়েছিলো। এ দেশের সাথে তারা নিজেরা মিশে গিয়েছিলো। এদের উদারতার নিদর্শন আমরা প্রচুর দেখতে পাই।

শ্রী চৈতন্যের যখন আবির্ভাব হয় তখন বাংলার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। চৈতন্য যে গ্রামে সংকীর্তন করতেন তার নাম ছিলো রাম কেলি। এই গ্রামটা হোসেন শাহ চৈতন্যকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এটা বলা যেতে পারে শ্রী চৈতন্য মুসলমান নৃপতির সহায়তা নিয়ে ধর্ম প্রচারে সক্ষম হন। অথচ চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা দেখতে পাই একদিন চৈতন্য নাম সংকীর্তন করতে বের হলে স্থানীয় কাজী তার শিষ্যদের আক্রমণ করেছিলেন। পরে চৈতন্য যখন দলবল নিয়ে কাজীর বাড়ি আক্রমণ করেন তখন কাজী চৈতন্যের পায়ের উপর পরে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। এর কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই।

চৈতন্যের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য এভাবে মুসলমানদের অদ্ভুতভাবে দেখানো হয়েছে। চৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণনাটি একটু দেখা যাক।

> *ক্রোধে বলে প্রভু আরে কাজী বেটা কোথা / ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা। নেচে নেচে বলেছেন চৈতন্য, আজি সব যবনের করিমু প্রলয়। (বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)*

AnyScanner

শ্রী চৈতন্য ছিলেন হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। যখন দেশের বহু নিম্ন হিন্দু সমাজে নিপীড়ন ও শোষণের ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে, তাদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনা অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে না গিয়ে হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকে সে উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় ভক্তি ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। এই ভক্তি ধর্মের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিলো বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা। এই সাহিত্যের যে মূলকথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক তাও ইসলাম সুফি দর্শন থেকে শ্রী চৈতন্য আহরণ করেছিলেন। এই বৈষ্ণব ধর্মের মতো ধারণা ইসলাম আসার আগে বাংলার হিন্দু সমাজে ছিল না।

দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের কোনো কোনো সেক্যুলার স্যুডো বুদ্ধিজীবী ইসলামের এই ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না অথবা তা অত্যন্ত তুচ্ছ বলে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। যারা অহর্নিশ মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতার পাঠ দান করেন, যারা মনে করেন ইসলাম এদেশে এসেছে তরবারির জোরে তারাও কি ইতিহাস থেকে মুসলিম সুলতানদের জামানার মতো উদার শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি দেখাতে পারবেন?

এদের কাছে বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের জন্য দুটি মাত্র তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। একটি হচ্ছে চৈতন্যের আবির্ভাব, অন্যটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। চৈতন্য, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আলাওলের আবির্ভাবও তাৎপর্যপূর্ণ, সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এদেশে ইসলামের আবির্ভাব। কারণ ইসলাম না এলে এই ধরনের পরিবর্তন আমরা দেখতাম না।

পুরো মধ্যযুগে একটা বড় অংশ কবি হলেন মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে যারা প্রধান কবি তারা হলেন মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকজন প্রধান কবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ। এর পাশাপাশি মুসলমান কবিরাও লিখেছেন। যদিও তখনও এই যুগে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি। ষোড়শ শতক থেকে মুসলমান কবিদের প্রবল প্রতাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি– সৈয়দ সুলতান, আলাওল, দৌলত কাজী, দৌলত উজির প্রমুখ। তারা ইসলামের কথা প্রচার করেছেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যে সৈয়দ সুলতানের কাব্যে

ইসলামের ইতিহাসকে ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করার একটা প্রয়াস দেখি। তিনি নবী বংশ রচনা করেছেন। এটি একটি দীর্ঘ কাব্য। এখানে হযরত আদম (আ.) থেকে রসূল (স.) পর্যন্ত সব কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন। এর মধ্যে রসূল (স.)-এর যে অংশ আছে তা অসাধারণ কাব্য গুণে মণ্ডিত। এখানে তিনি রসূল (স.)-কে মানবিক গুণসম্পন্ন করেছেন, দেবতা বানাননি। হিন্দুরা যে রকম বানায়। মঙ্গল কাব্যে, বৈষ্ণব কাব্যে যেমন আছে। এখানে ওফাতে রসূল অংশের মধ্যে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, রসূল (স.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তার কন্যা ফাতেমা-তুজ-জোহরা তার কাছে এসেছেন। তিনি তাঁকে বলছেন তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এর কারণ 'মোর চিত্ত বৃক্ষ ফল, তুমি স্নিগ্ধ সুশীতল, হৃদয় লতায় তুমি কলি'। অর্থাৎ 'আমার চিত্ত বৃক্ষ ফল হচ্ছ তুমি, সুশীতল সুগন্ধ তুমি, আমার হৃদয় লতার মধ্যে তুমি কলি'। কবিতার এই অসাধারণ ভাব-ব্যঞ্জনা, আবহ এটা মধ্যযুগে একেবারে বিরল। অনেক পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে দেখি পুত্রের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম, তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিফল হৃদয় ডোবে শোক সাগরে। মৃণাল যেথা জলে, যবে কুবলয় ধন কেহ লয় হরি। কাব্য সুষমা, কাব্য অলংকার, ভাব প্রকল্প এবং ধর্মচিন্তা ও বিশ্বাসে আলাওল সৈয়দ সুলতানের মতো সমতুল্য কবি একালেও খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেননি।

এদেশে ইসলাম আসার সাথে সাথে একটি মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। সেই সমাজের প্রয়োজনে একটি সংস্কৃতিও তৈরি হয়। তৈরি হয় একটি ভাষার। ভাষার প্রয়োজনে একটি বিশেষ ইডিয়মও আসে। প্রধানতঃ আরবী, ফার্সী, তুর্কী। কারণ মুসলমানরা ওসব দেশ থেকে এসেছিল। ওখানকার ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে একটি মুসলিম আবহ তৈরি হয়। এটিই বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতি। এর থেকে বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতির আছে তফাৎ। কারণ এতদিনে ধর্মের কারণে সংস্কৃতির ভিতরে রূপান্তর ঘটে গেছে। একই দেশে থেকে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বিকাশ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

১৯২৩ সালে, যখন ফোর্ট উইলিয়াম প্রবর্তিত বাংলা, শুদ্ধ বাংলা ও

AnyScanner

গোল্ডসেক নামে একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী যশোরে বসে একটি অভিধান সংকলন করেন। তিনি এর নাম দেন *A Mussalmani Bengali-English Dictionary.* যশোরে বসে তিনি দেখতে পান বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের ভেতর প্রচলিত কথ্য বাংলা ঠিক বাঙ্গালী হিন্দুদের মতো নয়। এর মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে। তিনি এ অভিধানে প্রায় ছয় হাজার আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দি শব্দের সংকলন করেন। যা নাকি মুসলিম সমাজে আকসার ব্যবহৃত হয়। পাদ্রী গোল্ডসেক তার অভিধানের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন–

> *Mussalmani Bengali is the name given to that form of the Bengali languages which is used by the Muhammadans of Bengal. It takes it's name from the large admixture of Arabic and Persian terms to be found therein, and which were introduced into the language by the Mussalman conquerors of Bengal in the twentieth century.....*
>
> *The Muhammadan supremacy in Bengal, before the advent of British rule, imposed an almost exclusively Persi-Arabic vocabulary upon the people wherever matters affecting the administration of the country were concerned. This 'Mussalmani' vocabulary still persists, and im all legal and Zemindari documents finds expression in numerous words of Muslim origin.*
>
> *Again in the everyday speech of the Muhammadan masses Mussalmani Bengali in the common medium of intercourse, and hundreds of Arabic and Persian words are constantly being used which have no connection whatever with pure Bengali, and which find no place in any ordinary dictionary of the Bengali language.*[৩২]

এসব শব্দগুলো বাংলায় এসেছে তখনকার প্রশাসনিক প্রয়োজনে, মুসলমানদের ধর্মের প্রয়োজনে এবং কিছুটা সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজনে। একটি সমাজ তার আত্মবিকাশের প্রয়োজনে নিজস্ব সংস্কৃতি তৈরি করে। সেই সংস্কৃতির কতকগুলো নিজস্ব ইডিয়ম থাকে। এসব শব্দ বা ইডিয়ম বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয় ও আত্ম-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছে মাত্র। শব্দ যেমন আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়েছে তেমনি

সেই সকল শব্দ দিয়ে তৈরি সাহিত্যও হয়েছে আত্মপরিচয়, মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার মানদণ্ড। কাসাসুল আম্বিয়া, আলিফ লায়লা, জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, লায়লি মজনু, ইউছুফ জোলেখা, আমির হামজা, চাহার দরবেশ, ছয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান, সোনাভান, গাজী কালু, চম্পাবতী প্রভৃতি নতুন সংস্কৃতির দাবিদার হিসেবে মাথা তুলেছে। এটা সত্য, মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছেন। কিন্তু সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সামগ্রিকতার নজীর নয়।

রেভারেন্ড উইলিয়াম গোল্ডসেকের আগে আরেকজন খ্রিষ্টান পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস লং (১৮১৪-১৮৮৭) মুসলমানী বাঙ্গালা কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি তার বাংলা পুস্তকের তালিকায় (Catalogue of Bengali Books) মুসলমানী বাঙ্গালা কথাটা প্রথম ব্যবহার করেন। তার সংকলিত বইয়ের ফর্দ দেখলে বুঝা যায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতী বা সংস্কৃতায়নকৃত বাংলা পুস্তক থেকে মুসলমান রচিত লেখকগুলোকে আলাদা করার জন্য তিনি এ নামটি দিয়েছিলেন। এরপর এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন তার *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার *Origin and Development of Bengali language* কিতাবে। মুসলমানী বাংলা কথাটা যদি সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগের জন্য ব্যবহার হয় তার তাৎপর্য অবশ্য একরকম। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো দেবভাষা সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ হিন্দু সাহিত্য ব্রতীদের লেখাকে বলতে হবে হিন্দুয়ানী বাংলা। কিন্তু আদতে সেরকম কিছু হয়নি। উল্টো ঐ কথাটার ভিতর দিয়ে মুসলমানের সাহিত্য সাধনাকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে এবং মুসলমানরা যে আলাদা ওটাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এনামুল হক লিখেছেন–

> *যদি ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্য-সেবককে ধর্মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সেবিত সাহিত্যকে 'মুসলমানী বাঙ্গালা' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে হ্যালহেড সাহেবের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বা মার্সম্যান প্রভৃতির বাঙ্গালা সাহিত্যকে 'খ্রিষ্টানী বাঙ্গলা' এবং তরুদত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির ইংরেজি সাহিত্যকে 'হিন্দুয়ানী ইংরেজী' বলা উচিত। ফলে তাহা হয় কি? যদি না হয়, তবে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি জৈনুদ্দীন, মোহাম্মদ সগীর, শেখ কবীর, ষোড়শ*

শতাব্দীর কবি মোহাম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন, আলাওল, মোহাম্মদ খাঁ প্রভৃতির বাঙ্গলা সাহিত্যকে 'মুসলমানী বাঙ্গলা' আখ্যায় আখ্যাত করা হয় কেন?.....

তবে কি ভাবের দিক হইতে বিচার করিয়াই কতকগুলি বাঙ্গালা কাব্যকে 'মুসলমানী বাঙ্গালার' ঘৃণ্য ছাপ দেওয়া হয়? লেখার মধ্য হইতে কিংবা কথার ভিতর হইতে যতটুকু নজীর সংগ্রহ করা যায়, তদদ্বারা এমন কোনো ব্যাপার বুঝিতে পারা যায় না। আর যদি বাঙ্গালা কাব্যে ইসলামী ভাবের প্রাধান্য হইলেই তাহাকে 'মুসলমানী বাঙ্গলা' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে বাঙ্গলার বৈষ্ণব-রচিত পদাবলী সাহিত্যকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বস্তু বলিয়া নির্দেশ না করিয়া তাহার গায়ে মুসলমানী বাঙ্গালার ছাপ মারিয়া সে গৌরবটুকু বাঙ্গলার মুসলমানকেই দেওয়া উচিত; কেননা পদাবলী সাহিত্যটির আগাগোড়া মুসলমানদের সুফী-সাহিত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এবং ভাব-সামঞ্জস্যের প্রাচুর্যে পরিপূরিত। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কোনো বাঙ্গালী (অবশ্য বাঙ্গালার মুসলমানকে বাদ দিয়া) তাহা করিতে স্বীকৃত আছেন বলিয়া মনে হয় না। এই হিসাব ধরিতে গেলে, কবি নজরুল ইসলামের 'হাফেজের অনুবাদ' এবং নরেন দেবের, 'ওমর খৈয়াম' সমভাবে 'মুসলমানী বাঙ্গালা'। কিন্তু, হিন্দুগণ কান্তিঘোষ কি নরেন দেবকে 'মুসলমানী বাঙ্গালা'র লেখক বলিয়া এক ঘরে করিয়াছেন?[৩৩]

নিজের সংস্কৃতির প্রয়োজনেই সেদিন বাঙ্গালী মুসলমানরা তাদের ভাষাকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলো। এটাকে বলা চলে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধ। এরকম নজীর পৃথিবীতে এমনকি উপমহাদেশেও বিরল নয়। এর একটি সাম্প্রতিক নজীর দিয়েছেন হাবিবুর রহমান–

যুগোশ্লাভিয়ার সরকারি ভাষা ছিলো সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান। সার্বিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান ভাষাভাষীদের কাছে উভয় ভাষা সহজে বোধগম্য ছিলো। সার্বিয়ান লেখা হতো সিরিলিক হরফে। সেই ভাষায় ইস্টার্ন অর্থডক্স, রাশিয়ান সংস্কৃতি এবং প্রাচীন চার্চ স্লাভিকের প্রভাব বেশি। পক্ষান্তরে, ক্রোয়েশিয়ান [illegible]

*লিক ও জার্মান সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৯১ সালে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার উপর জোর দিতে গিয়ে সার্বিয়া যেসব প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিলো, তার সর্বাগ্রে ছিলো সিরিলিক হরফে লেখা সার্বিয়ানকে দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া। আগের সার্ব-ক্রোয়েশিয়ান ভাষা শুধু সার্ব নামে চালু হলো।*

*ক্রোটরা তাদের ভাষাকে এখন শুধু ক্রোয়েশিয়ান বলে। তুর্কি ও বিদেশি শব্দ বিদায় দেওয়ার জন্য এক শুদ্ধি আন্দোলনে তারা তৎপর। অন্যদিকে বসনিয়ানরা তাদের ভাষায় আরবী ও তুর্কি ভাষার শব্দ অন্তর্ভুক্ত ও আত্মীকৃত করতে চায়।*[৩৪]

মোঘল জামানায় উত্তর ভারতের হিন্দুস্তানী ভাষাকে ফারসী হরফে লিখে ও আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণে মুসলমানরা উর্দুর মতো একটি ভাষা তৈরি করেছিলো। এ ভাষায় পরে তৈরি হয়েছিলো গালিব, ইকবাল, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো কবি। শুধু তাই নয় এ ভাষাই পরবর্তীকালের উত্তর ভারতের মুসলমানদের সংস্কৃতির ভাষা হয়ে ওঠে। মূল হিন্দুস্তানী ভাষাকে উর্দু বানানো হিন্দুরা সহজভাবে গ্রহণ করেনি। তারাও উনিশ শতকে হিন্দুস্তানী ভাষাকে দেবনাগরী হরফে লিখে সংস্কৃত সমৃদ্ধ হিন্দি ভাষা বানিয়ে নেয়। স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে তৈরি হয় ভাষা বৈরিতা। সেখান থেকে উর্দু-হিন্দি বিরোধ যা পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়। সেই দ্বন্দ্বের ফলাফল ভারত বিভাগ।

বাংলার মুসলমানরাও ফারসী বা আরবী হরফে লিখে বাংলা ভাষার ভিতর থেকে আর একটি উর্দুর মতো ভাষা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনের গৌরবময় যুগে তারা সে চেষ্টা করেছিলেন বলে উর্দু সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিলো। বাংলার মুসলমানরা এ চেষ্টা চালান মূলতঃ নবাবী আমলের শেষ দিকে এসে। সে সময় আলাওলের পদ্মাবতীর মতো কাব্যও আরবী হরফে লেখা হয়েছিলো। কিন্তু মুসলিম রাজশক্তির পতনের ফলে এই চেষ্টা প্রবল শক্তিশালী হতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত এ প্রয়াস খতম হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রশ্রয়ে যে বাংলা ভাষার বিকাশ হয় তা ছিল হিন্দু ধর্মের ভাষা সংস্কৃত সমৃদ্ধ। এটি হয়ে ওঠে সাহিত্যের ভাষা; একই সাথে শিক্ষার ভাষাও বটে। অনেকটা নিরূপায় হয়ে এই বাংলার আয়নার

AnyScanner

ভিতরে বাঙ্গালী মুসলমানকে সেদিন তার নিজের মুখ দেখতে হয়েছে এবং সেটি দেখতে যেয়ে সে আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়েছে। আজকের যে বাঙ্গালী ও মুসলমানের দ্বন্দ্ব তার শুরু এখান থেকেই।

ছয়

ব্রাহ্মণরা কখনোই বাংলা ভাষা চর্চাকে ভালোভাবে নেয়নি। সেন আমলে তারা বাংলাভাষাকে খতম করতে চেয়েছিল। মুসলিম আমলে হোসেন শাহের দরবারে যখন বাংলা সাহিত্য চর্চার সমারোহ চলছে তখনও ব্রাহ্মণরা এটি প্রথম দিকে সুনজরে দেখেনি। তবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াবার সাহস করেনি। উপরন্তু অন্যান্য কবিরা যখন নিজেদের কাব্য রচনার জন্য সুলতানের কাছ থেকে প্রচুর ইনাম, বেতন ও পুরস্কার বাগিয়ে নিতে লাগলো, তখনই কেবল তারা রাজ দরবারে এসে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করলো।

পলাশীর বিপর্যয়ের পর নতুন পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে মিত্রতার সূত্রে ব্রাহ্মণরা আবার ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে এবং তাদের ভিতরকার লুকানো জাতক্রোধ, ঘৃণা-বিদ্বেষ পুনরায় জেগে ওঠে। ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগে ব্রাহ্মণরা চেয়েছিল মুসলিম রাজশক্তিকে খতম করে দিতে এবং এতে তারা শতভাগ কামিয়াব হয়। রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি বাঙ্গালী মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোও তারা ধ্বসিয়ে দেয়। বিশেষ করে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে যে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিলো, তার উপর ব্রাহ্মণ্য অধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রশ্রয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে একদল পাদ্রী ও পণ্ডিত যৌথভাবে বাংলা ভাষার কাঠামো পরিবর্তন করতে না পারলেও আকৃতির ব্যাপক রদ-বদল করে ফেলে। ব্যাকরণ ঠিক থাকে কিন্তু ভাষা স্ফীত হয় হিন্দুদের দেবভাষা সংস্কৃতের শব্দাবলীতে।

আসলে এই বাংলা ছিলো হিন্দুয়ানী বাংলা। ঔপনিবেশিক ইংরেজ ক্ষমতা নিয়েছিল মুসলমানদের হাত থেকে। তাই তারা পলাশীর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর প্রথম সুযোগেই মুসলমানদের তৈরি ভাষাকে বিকৃত করে দিতে চেয়েছিলো, যাতে তাদের আত্ম-পরিচয়ের উৎসমুখ শেষ

হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে না পারে। সেদিন বাংলাভাষাকে সংস্কৃত জননীর কন্যার মুখোশ পরিয়ে বাংলা ভাষার আর্যায়ন বা ব্রাহ্মণীকরণ এইভাবে সুসম্পন্ন হয়। সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের লেখায় এসব সত্যের সাক্ষ্য মেলে–

> *১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হ্যালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমতো ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানির সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজি প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসর। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, আরবী-পারসীকে অশুদ্ধ পদ ধরিয়া শুদ্ধ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধানও রচিত হয় ও প্রচারিত হইয়াছিলো। সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিলো।*[৩৫]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার আর্যীকরণের সাথে যুক্ত হন উপরে বর্ণিত খ্রিষ্টান পাদ্রী হ্যালহেড, উইলিয়াম কেরী, হেনরী পিটস ফরস্টার। এদের সাথে হাত মেলান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামরাম বসু প্রমুখ। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিকতার উদরে এইভাবে জন্ম হয় আধুনিক বাংলা গদ্যের। যে গদ্যের সাথে বাংলাদেশের আমজনতার ভাষার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট কিছু পাদ্রী ও ব্রাহ্মণের চেষ্টায় এইভাবে বাংলা ভাষাকে মুসলমান মুক্ত করা হলো এবং প্রচার করা হলো বাংলা ভাষার নবযুগ আরম্ভ হয়েছে। মূল বাংলা ভাষা ও তার স্রষ্টা মুসলমানদের প্রতি এদের অসূয়া কত গভীর ছিলো তা বুঝানোর জন্য

AnyScanner

চেষ্টা করেছেন সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাফ দিয়ে পড়েছিলো :

> "হিসাব করে দেখা গেছে, যে ভাষা আমাদের নামজাদা সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় ব্যবহার করছেন, তার শতকরা দুটি অনার্য, পঁচিশটি সংস্কৃত, পাঁচটি আধা সংস্কৃত, ষাটটি সংস্কৃত থেকে ভেঙ্গে সোজা করে নেওয়া আর আটটি হচ্ছে বিদেশী অর্থাৎ কিনা আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি।"

অর্থাৎ উৎপত্তির দিক দিয়ে শতকরা হিসাব করলে বর্তমান বাংলা ভাষার তুলনামূলক শব্দের পরিমাণ হচ্ছে এরকম–

| | |
|---|---|
| ১. অনার্য শব্দ (দেশি) - | ২ |
| ২. সংস্কৃত শব্দ - | ২৫ |
| ৩. আধা সংস্কৃত শব্দ - | ৫ |
| ৪. সংস্কৃত থেকে ভেঙ্গে সোজা করে নেওয়া - | ৬০ |
| ৫. বিদেশী শব্দ (আরবী, ফারসী, ইংরেজী, পর্তুগীজ) - | ৮ |
| সর্বমোট : | ১০০ |

উপরোক্ত চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়, ফোর্ট উইলিয়ামের কল্যাণে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় শতকরা আশি ভাগেরও অধিক।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন যে চর্যাপদকে বলা হয় সেখানেও সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা মোট ২০০০ শব্দের মধ্যে ১০০টি। শতকরা হিসাবে ৫টি। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৫।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিপত্য ঔপনিবেশিক ক্ষমতার প্রশ্রয়ে পাদ্রী ও ব্রাহ্মণের যৌথ প্রয়োজনার ফসল। পাদ্রী উইলিয়াম কেরী প্রথম জীবনে দিনাজপুরে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করতেন। সেখানে স্থানীয় লোকদের সাথে কথোপকথনে তার কাছে মনে হয়েছিলো বাংলা ভাষা আসলে একটি নয়, দুটো। একটি ব্রাহ্মণদের ব্যবহৃত বাংলা। অন্যটি আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলা যা মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্যবহার করে।"

এই কেরীকে ব্রিটিশরা বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিয়ে আসে। এখন তিনি পাদ্রী নন, রীতিমতো [illegible]

পুনর্জন্মপ্রাপ্ত এই শিক্ষক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন। ১৮০১ সাে লেখা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণে তিনি দাবি করেন–

> *Multitudes of words originally Persian and Arabic a constantly employed in common conversation, whic perhaps ought to be considered enriching rather tha corrupting the Bangali language.*[৩৯]

অথচ কেরীই ১৮১৮ সালে লেখা ব্যাকরণের চতুর্থ সংস্করণে দা করেছেন বাংলার শতকরা আশিটি শব্দ হচ্ছে সংস্কৃত উদ্ভূত। এ কয় বছরের মধ্যে তার মনো পরিবর্তনের কারণ কি? কারণ ইংরে রাজশক্তির ক্ষমতা। তিনি এমনই বদলে গেলেন যে তিনি বাংলাকে প্রা সংস্কৃত বানিয়ে দিলেন। তিনি লিখেছেন–

> *The Bengalee may be considered as more nearly allie to the Sangskrit than any of the other languages c India.......four fifths of the world in the languages are pur Sangskrit.*[৪০]

সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাংলার প্রতি ছিল বিজাতীয় ঘৃণা। কিন্তু ইউরোপীয় যখন প্রথম দিকে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন তখন তারা পণ্ডিতদে ভাষার অনুকরণে এটি লেখেননি। লিখেছেন আম জনতার ভাষার কথ ভেবে।

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক পর্তুগীজ পাদ্রী মানুয়েল দা আস-সুম্পসাঁও, যিনি ১৭৩৩ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত এই ২৪ বছর পূর্ববঙ্গে প্রধানতঃ গাজীপুরে ভাওয়ালে অবস্থান করেছিলেন। লিসবন থেকে যে বাংলা ভাষার ব্যাকর প্রকাশ করেন, সেখানেও তিনি বাংলা ভাষা বলতে দেশি শব্দ বুঝেছেন সংস্কৃত নয়। হ্যালহেড সাহেব যিনি কেরীর সাথে ফোর্ট উইলিয়া কলেজে ছিলেন তিনি তার ব্যাকরণে স্বীকার করেছেন–

> *At present those persons (the Bengalees) are thought t speak the compound idiom with the most elegance wh mix with the pure Indian verbs, the greatest number o Persian and Arabic nouns.*[৪১]

AnyScanner

স্বীকার করলে কি হবে? ঐ ইংরেজের দাপট শেষ পর্যন্ত তাকেও সাথে মিলিয়ে দিয়েছে, যেমন দিয়েছে পণ্ডিতদের এবং ঔপনিবেশিক দেখভাল করার দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের সময়কালের কবি ভারতচন্দ্র যেখানে যাবনী মিশাল দিয়ে রস সৃষ্টির কথা বলেছেন, পণ্ডিতেরা তার কথায় কর্ণপাত করেননি। পণ্ডিত ও পাদ্রীরা প্রচার করেছেন এর দ্বারা ভাষার শুদ্ধতা হানি হয়েছে। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বিংশ শতাব্দীর সাম্প্রতিক কালের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন–

> *মুসলমান আমলে ফার্সী বাধ্যতামূলক হওয়ায় বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক আরবী-ফারসী শব্দ রয়েছে এবং তার তৎসম শুদ্ধতা/সাবলীলতা নষ্ট করেছে। তাঁর (হ্যালহেডের) খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১৭৭৮) বাংলা ভাষার পুণর্জন্মেরই প্রথম প্রদক্ষেপ।*[৪১]

এখানে তিনি দেব ভাষা সংস্কৃতর বাহুল্যকেই বিশুদ্ধ বাংলার লক্ষণ হিসেবে ধরেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গিটাকে কি হিন্দুয়ানী বলা চলে? সংস্কৃত হিন্দুয়ানী ভাষার পুনর্জন্মটাই তার কাছে রেনেসাঁ। অমলেশ ত্রিপাঠী তার *ইতালীর র‍্যানেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি* বইয়ে আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির আদর্শ সন্ধান করতে যেয়ে তিনি যা পেয়েছেন তা হলো ব্রিটিশের প্রশ্রয়ে লালিত কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালী হিন্দুর এক জগৎ। এর পাশে বাঙ্গালী মুসলমানের যে একটা বিরাট জগৎ রয়েছে বা ছিলো তা তিনি বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন।

একই রকম চিন্তা করেছেন বাংলা ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন :

> *We have elaborate grammars of Sanskrit masquerading as Bengali grammar in which the genuine Bengali forms have been branded as vulgar (ashadhu) beside the so called polite (sadhu) forms borrowed from Sanskrit.*[৪২]

সুনীতির চোখেও সংস্কৃত হচ্ছে শুদ্ধতম ভাষা। বাংলা হচ্ছে অসাধু এমনকি অশ্লীল। বাংলা ভাষার পণ্ডিতের এই সংস্কৃত প্রীতি কেন? কারণ সংস্কৃত ভাষার চোখ দিয়ে তিনি বাংলাকে দেখেছেন। এমনকি ভারতবর্ষকেও দেখেছেন। ভারত সংস্কৃতি বইয়ে সুনীতি লিখেছেন :

AnyScanner

> *সংস্কৃত ভাষাই হিন্দু ভারতকে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা চালিত ভারতকে একসূত্রে বাঁধিয়া খণ্ড-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নানা প্রদেশকে মিলিত করিয়া এক অখণ্ড দেশে পরিণত করিয়াছিলো।*[৪৪]

এই যে অখণ্ড ভারতের ধারণা এটা প্রচার করতো আর এস এস, হিন্দু মহাসভা, পরে প্রচার করেছে কংগ্রেস, এখন করছে বিজেপি। সুনীতিবাবুর এই অখণ্ড ভারতের ধারণা শুধুমাত্র ভৌগোলিক দেশের ধারণা নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক ধারণাও বটে। তবে এই ধারণা শুধুমাত্র সুনীতিবাবুর নয়। এরকম মহাভারতীয় জাতীয়তার ধারণা রবীন্দ্রনাথসহ আরও অনেকে করেছেন। দ্বিজাতি তত্ত্বতো এমনি এমনি খাড়া হয়নি।

সুনীতিবাবু বলেছেন, "বাঙালীরা হচ্ছে আট আনা ভারতীয়, আট আনা স্থানীয়। আকারে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি-বাঙালীরা ভারতীয় বটে।"[৪৭] তিনি মানেন যে পশ্চিম বাংলার উপর ভারতীয় আধিপত্যের একটা দিক আছে। কিন্তু তবু তার কাছে অখণ্ড ভারতের সংস্কৃতির সত্যটাই বেশি রকমের সত্য ও উজ্জ্বল মনে হয়।

ঐ বই থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি মতামতের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি তাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন–

> *১৮৯২ সালের পূর্বেই তিনি সমগ্র ভারতের একতার অন্যতম সাধন-স্বরূপ হিন্দী ভাষার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন খুব অল্প সংখ্যক লোকই এদিকে অবহিত হয়েছিলেন।*[৬১]

বাংলা ভাষার পণ্ডিত বাংলা ভাষার কথা বলছেন না, বলছেন ধর্মের জোরের কথা। প্রথমে বলেছেন সংস্কৃত'র কথা যা প্রাচীনকালে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পরে বলেছেন হিন্দির কথা যা আধুনিককালের ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে। ভূদেব বাবুর মতো তিনিও চাইতেন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি, আর দেশের ভিত্তি হবে হিন্দি জাতীয়তাবাদ।

সুনীতি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ভারতের *ভাষা ও ভাষা সমস্যা* বইয়ে হিন্দিকে ভাবী ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত ছিলেন।

AnyScanner

*বাঙ্গালীর ইতিহাস* লিখে বিখ্যাত হয়েছেন নীহার রঞ্জন রায়। এ ইতিহাস আমাদের এখানকার সেকুলার ভাবুকদের কাছে খুবই আদৃত। কিন্তু যে আমলের ইতিহাস তিনি লিখেছেন সে সময় বাংলা, বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা ভাষা বলে কিছু ছিলো না। তিনি মূলতঃ লিখেছেন, প্রাচীন হিন্দু আমলের ইতিহাস। তবু এ বইকে সমগ্র বাঙ্গালীর শুদ্ধ ইতিহাস হিসেবে কেন বিবেচনা করা হয় তা একটা বড় প্রশ্ন। এর পিছনে ইতিহাসগত বিবেচনার চেয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতিগত বিবেচনাটাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সেই প্রাচীন হিন্দু আমলের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন-

> *গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির মধ্যে ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে এই দেশ ক্রমশ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক অংশীদার হইয়া ওঠে।*[৪৭]

এই যে নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি টান এটা কিন্তু ঠিক বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি টানের জন্য নয়। এটি হয়েছিলো হিন্দু ধর্ম ও মহাভারতীয় জাতীয়তার প্রতি এক ধরনের অতিরিক্ত আকর্ষণের কারণে। *বাঙ্গালীর আদি ইতিহাস* বইয়ের ভূমিকায় তিনি বঙ্গ বিভাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বাঙ্গালীর ২০০০ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, তার এই দুঃখের কারণ কিন্তু ঠিক বঙ্গ বিভাগের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বিভাগের ফলে বঙ্গের যে একাংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এ কথাটা বিবেচনা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, এ দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের।

উনিশ শতকের বাংলার সবচেয়ে শক্তিমান লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফোর্ট উইলিয়ামের সংস্কৃত বাংলায় তিনি তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলো লিখেছেন এবং ঐ বাংলাকে তিনি অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে ছাড়া আধুনিক বাংলা ভাষার আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও তো সত্য ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত তার হাত ধরেই হয়েছে। সে কালের বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকী *বঙ্গ দর্শনে*'র তিনি সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তার বঙ্গ দর্শনটা সত্যিকারের বঙ্গ দর্শন হয়ে ওঠেনি, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দর্শন হয়ে ওঠেছে।

বঙ্কিম তার নিজের সম্পাদিত পত্রিকায় ১২৮৭ পৌষ সংখ্যায় বাঙ্গালীর উৎপত্তি নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিম তার প্রবন্ধে একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নটি হলো, লোক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাংলাদেশে বাস করে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয় তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক মুসলমান, ইহারা বাঙ্গালী বটে। কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিক ধর্মাবলম্বী জাতির সন্তান?

বঙ্কিম তার নিজের উঠানো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিজেই বলেছেন বাঙ্গালী এক ভাষায় কথা বললেও তারা আসলে এক জাতি নয়। বঙ্কিমের মতে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদেরকে চার ভাগে বিভক্ত করা চলে–

১. আর্য হিন্দু।
২. অনার্য হিন্দু।
৩. আর্য- অনার্য মিশ্র হিন্দু।
৪. বাঙ্গালী মুসলমান।

এই চারভাগ পরস্পর থেকে পৃথক। এদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। বঙ্কিমের মতে, ইংরেজকে যে অর্থে এক জাতি বলা হয়, বাঙ্গালীদের সে অর্থে এক জাতি বলা সম্ভব নয়। ইংরেজদের মধ্যে এঙ্গল, স্যাকসন, নর্মানরা মিশে যেতে পেরেছে। এদের মধ্যে রক্তের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সেরকম কোনো বন্ধন সৃষ্টি হয়নি। তার নিজের ভাষায়, *ইংরেজ এক জাতি, বাঙ্গালী বহু জাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি তাহাদের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় অর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালী সমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে কেবলই আর্য। এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী জাতি অমিশ্রিত আর্য জাতি বলিয়া বোধ হয় এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস এক আর্য বংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।*[৪৮]

বঙ্কিমের এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিন্দু-বিসর্গ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি এখানে বাঙ্গালী নয়, আর্য হিন্দুর নেতৃত্বই চাচ্ছেন। বঙ্কিম বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনা

AnyScanner

করেছেন এসবই সত্য। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। ভাষার ভিতর দিয়ে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদ মজবুত করতে চেয়েছিলেন।

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের দিকে যাবো। উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটেছিল তার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার সৃষ্টিশীলতা অসাধারণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ কিংবা বাঙ্গালীদের পৃথক রাষ্ট্র চাননি। রবীন্দ্রনাথ ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতী বাংলা থেকে কিছুটা হলেও সরে এসেছিলেন। ঐ বিশেষ বাংলায় সাহিত্য সাধনা করা কষ্টকর এটা তিনি শিল্পী হিসেবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি শিবাজী উৎসব কবিতা লিখেছিলেন এটাও সত্য। এখানে তিনি এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সেটা অবশ্য হিন্দু ধর্মরাজ্য। তার স্তাবকরা বলবেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ ধ্যান ধারণা থেকে পরে সরে এসেছিলেন। তিনি তার শিবাজী উৎসব কবিতাটি কোনো গ্রন্থে স্থান দেননি। হতে পারে এটা সত্য কথা। কিন্তু এরপর তিনি শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। এটাকে তিনি তপোবনের আদর্শে গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শের কথা তিনি এমনিভাবে ত্রিপুরার রাজার কাছে বিবৃত করেছেন–

> *আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই। .... বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। .... ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্মো ভয়াবহ।*[৪১]

এর মধ্যে বাঙ্গালীও নেই, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদও নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়েছে। বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> *হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না – এইখানে তারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু।*[৪০]

ধর্মান্তরের পরও হিন্দু হিন্দু থাকে কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছেন–

AnyScanner

*ইহার মধ্যে পারাপারির তর্ক মাত্রই নাই। ইহা সত্য, .... বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে .... কিন্তু তাহারা হিন্দু মুসলমান। .... হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা জাতিগত পরিণাম।*[৫১]

এখানেও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির কাঠামোর ভিতরে একটি ভারতবর্ষীয় ঐক্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষ যে একটি বহুধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ এটি তার মাথায় আসছে না। একারণেই কি তিনি শেষ পর্যন্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভারতের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন। হিন্দির পক্ষে মহাত্মা গান্ধির কাছে লেখা রবীন্দ্রের চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

*Hindi is the only possible national language for inter-provincial intercourse in India. But about its introduction at the Congress, I think we can not enforce it for a long time to come ..... Hindi will have to remain optional in our national proceedings until a new generation of politicians, fully alive to its importance, pave the way toward its general use by constant practice as voluntary acceptance of a national obligation.*[৫২]

এ চিঠির ভাষার মধ্যে একজন ভারতবর্ষীয় সাধকের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যায়, বাঙ্গালী হিসেবে এতে ঠিক আশ্বস্ত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' তখন তাকে ভারতপথিক হিসেবে বেশি মানায়, বাংলা পথিক হিসেবে নয়। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাও ভূগোল ছাড়িয়ে সাংস্কৃতিক হয়ে ওঠেছে বেশি। কখনো কখনো তা হয়ে ওঠেছে প্রাচীন ভারতীয় উপনিষদিক। বাংলা ভাষার কবি হলেও এখানে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা তার চিন্তায় বেশি ধরেনি। রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালীত্ব ছিলো ভারতীয় আয়নায় বাঙ্গালীকে দেখা, বাঙ্গালীর আয়নায় ভারতকে দেখা নয়। আমাদের দেশের সেক্যুলার ভাবুকরা, যারা রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের পুরোহিত হিসেবে মান্য করেন তাদের বিঘোষিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদও কি রবীন্দ্রের জাতীয়তাবাদের মতো অনুরূপ কিছু, না এর কিছু আলাদা তাৎপর্য আছে, সেটার বিচারও জরুরী।

AnyScanner

রবীন্দ্রনাথ হিন্দিকে শুধু ভাষা হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন মহানদী হিসেবে, যার ভিতরে ভারতের অন্যান্য ভাষারূপী নদীসমূহ আত্মবিসর্জন দিয়েছে। যেমন করে ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে লুপ্ত হয়েছে ভারতের সমস্ত জাতিগোষ্ঠী। প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক এম জে আকবর লিখেছেন–

> *ভারতের বিভিন্ন ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণনা করছেন বিভিন্ন নদীর নামে। হিন্দীকে বলেছেন মহানদী, অর্থাৎ বিরাট নদী। শেষ পর্যন্ত দেশের মহানদীকে ভূমিকা দেওয়া হলো। কিন্তু সেই মহানদীর স্রোতধারা কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য দেশ প্রস্তুত হয়েছে কিনা, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে।*[৫৩]

শুধু হিন্দি প্রীতি নয়, রবীন্দ্রের সংস্কৃত প্রীতিও লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃত একটা মৃত ভাষা। কেননা, এটা কারো ভাষা নয়, মুখের ভাষাও নয়। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মের ভাষা। এ ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত লেখা হয়েছে। এ ভাষা মূলত ব্রাহ্মণরাই ব্যবহার করতো। শুদ্রের সংস্কৃত শিখবার অধিকার ছিলো না। তবুও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ এই ভাষার প্রতি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন–

> *বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কবির প্রীতি সর্বজন বিদিত, কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের বুনিয়াদ না হইলে ভারতীয় ভাষার উপর দখল হওয়া কঠিন। সেই জন্য তিনি বিশ্ব ভারতীর ছাত্রদের পক্ষে পানিনির ব্যাকরণ পাঠ প্রায় আবশ্যিক করিয়া তোলেন। ... কবির বরাবরই ইচ্ছা ছিলো যে, বিদ্যালয়ের শেষ চারি বৎসর ছাত্রদের একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ, যেমন মধ্য ও লঘু কৌমুদী মুখস্থ করাইয়া দিতে পারিলে চিরকালের মতো সংস্কৃতের বুনিয়াদ গাঁথা হইয়া যাইবে।*[৫৪]

এই যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি রবীন্দ্রের এক ধরনের অতি আকর্ষণ এর পিছনে তো ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। না হলে সংস্কৃত মৃত ভাষা হওয়া সত্ত্বেও হাজার হোক রামায়ণ মহা ভারতের ভাষা। এর আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রবীন্দ্রের কাছে মোটেই কিঞ্চিতকর নয়। এই কারণে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়ে সংস্কৃত ভাষার একটি ব্যাকরণ লেখেন যার নাম *সংস্কৃত শিক্ষা*।

AnyScanner

আমরা বেখবর-বেখেয়াল বাঙ্গালরা না জানলেও রবীন্দ্রনাথ 'কালচার' এর আদি তরজমা কৃষ্টির (উচ্চতর মূল্যবোধ ও রুচির চর্চা) বদলে সংস্কৃতি (ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুযায়ী জীবন ধারা) চালু করেন এবং একসময় বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ ভাষার (সংস্কৃত) খপ্পর থেকে মুক্ত করার 'কেমেল পাশা' বনার মহৎ ইচ্ছার কথা ভুলে গিয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির তীর্থ স্থান হিসেবে পরিচিত শান্তি নিকেতনে বসে বাংলা ভাষাকে আরও বেশি সংস্কৃত অনুগত করার জন্য নিজস্ব পণ্ডিত হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়কে দিয়ে একটি সংস্কৃত বহুল বাংলা অভিধান তৈরি করান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানীদের বর্ণিত Sanskritization বা সংস্কৃতায়ন, সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে বিধৃত ব্রাহ্মণ্যবাদের গ্রেট ট্রাডিশনকে পুনরুজ্জীবিত করা।

এই যে ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত, দেবনাগরী হরফে হিন্দি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা এর মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে। এই বন্ধন তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি মোটেই কম নয়। এই বিশেষ চিন্তা-ভাবনা সেকালের হিন্দু মহাসভা এবং একালের বিজেপির চিন্তা ভাবনার সাথে খুব মেলে। একে Pan Hinduism বললেও অতিকথা হয় না। এই কারণেই 'গুরুদেবের' অনুকরণেই দিল্লির শাসকরা তাদের সংবিধানে উল্লিখিত দেশের সব ভাষাকে সংস্কৃতের সহায়তায় আরও সমৃদ্ধ করার আইনি নিদের্শ জারী করেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথের অনেক পরের মানুষ। আধুনিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি নিয়ে তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। এপার বাংলায় তিনি চাকরি করেছেন বহুদিন। এপারের বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ নিয়ে তার জানাশোনাও ছিলো। কলকাতায় বসে ১৯৫২ সালে এপার বাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে তিনি গভীরভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন একথা তিনি তার লেখায় জানিয়েছেন। এপার বাংলাকে নিয়েও তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন[৫৮] যা পড়ে আমাদের এখানকার কেউ কেউ মুগ্ধতার ঘোরে ডুবে থাকেন। এই অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলা সাহিত্যের সেবক হয়েও শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির মোহ অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি কয়েকবার ঢাকায় আসেন। নতুন দেশের অনেক নেতার সাথেও তার দেখা হয়। কিন্তু তারও বাংলাদেশ বা বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবালুতা শুধু এপার বাংলার

AnyScanner

মানুষের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিলো। ওপার বাংলার জন্য বাংলা নিয়ে তার কোনো অতিরিক্ত আবেগ ছিলো না। ঢাকা থেকে ফিরে যেয়ে তিনি তার অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে :

*সম্মেলনের বাইরেই আসল মিলন। ভাব বিনিময়ের অসংখ্য সুযোগ। কত জনের সঙ্গে কত জায়গায় যে দেখা হলো। বাংলাদেশের লোক যেমন বাংলাভাষা সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বদ্ধপরিকর, পশ্চিমবঙ্গের লোক তেমন নয় কেন? কেন ওরা ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরে আছে? আমাকেই বেকায়দায় পড়ে জবাবদিহি করতে হয়। বলি, "ইংরেজীকে বিদায় দিলে তার শূন্যতা পূরণ করবে বাংলা নয় হিন্দী। তখন হয়তো হিন্দীর বিরুদ্ধে তেমনি লড়তে হবে যেমন লড়তে হয়েছিলো উর্দুর বিরুদ্ধে। তার মানে আর একটা একুশে ফেব্রুয়ারি, আর একটা মুক্তিযুদ্ধ, আরও ত্রিশ লক্ষের প্রাণহানি। পশ্চিমবঙ্গ স্বতন্ত্র হতে চায় না। চাইলেও তার দাম দিতে পারবে না। সবচেয়ে ভালো ইংরেজির জায়গায় শূন্যতা সৃষ্টি না করা। আমরা ভারতেই থাকতে চাই। তাই ইংরেজিকে আঁকড়ে ধরে আছি। কিন্তু যেখানে যতটা সম্ভব সেখানে ততটা বাংলা আমরাও প্রবর্তন করছি।"[৫৫]*

প্রকৃত কথা হলো, অন্নদাশঙ্করও মহাভারতের জানালা দিয়ে বাংলাকে অবলোকন করেছেন। এপার বাংলায় বাঙ্গালীয়ানার উত্থানকে তিনি সুনজরে দেখেছিলেন বটে, কারণ তাতে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা দুর্বল হয়ে যাওয়ার বিলক্ষণ ইঙ্গিত ছিলো। কিন্তু ওপার বাংলার ক্ষেত্রে তিনি বাংলা নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেননি, কারণ তাতে তার আরাধ্য মহাভারতের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তো। দুই বাংলা যে মোটেও এক নয় একথাও তিনি ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে একরকম বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ একই প্রবন্ধে তিনি লেখেন–

*রাজনৈতিক অর্থে ওঁরা আর আমরা এক হতে পারবো না কেন, তার কারণ এ নয় যে, ওঁরা প্রধানত মুসলমান ও আমরা প্রধানত হিন্দু। পাকিস্তানিরাও তো প্রধানত মুসলমান। নেপালীরাও তো প্রধানত হিন্দু। কারণটা এই যে, একটা নেশন সৃষ্টি হয় সংগ্রামের কামারশালে, অনেক মার খেয়ে, অনেক পোড় খেয়ে। ভারত যে সংগ্রামের [illegible] বাংলাদেশ সে সংগ্রামের ভিতর*

*দিয়ে নেশন হয়নি। হয়েছে স্বতন্ত্র এক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, হয়েছে স্বতন্ত্র একদল শহীদের রক্ত মেখে। দুই নেশনের মার্টারোলজি দুই রকম। ওঁরা যাঁদের স্মরণ করেন আমরা তাদের করিনে। আমরা যাঁদের স্মরণ করি ওঁরা তাদের করেন না। একুশে ফেব্রুয়ারি, সাতই মার্চ, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বর ওঁদের পঞ্জিকায় এক একটি চিরস্মরণীয় দিবস। কোনোটি শোকের সঙ্গে, কোনোটি আনন্দের সঙ্গে। সে সব দিবস আমাদের কাছে অর্থবহ নয়। তেমনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় আরও কয়েকটি দিবস। শোকের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে। আমাদের সুখ-দুঃখ এক নয়।*[৩৬]

আসল কথা হচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ামের পথ ধরে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে যে জাতীয়তাবাদ তৈরি হলো তার হিন্দুয়ানী কাঠামোটাই প্রধান। অবস্থা এমন দাঁড়ালো রাজনৈতিক ক্ষমতার সূত্রে বাঙ্গালী-হিন্দুরা বাঙ্গালী শব্দটাই আত্মসাৎ করলো এবং বাঙ্গালী মানেই হিন্দু এই সমীকরণ তৈরি করলো। মুসলমানরাও যে বাংলাভাষী এটা তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্থান পেলো না। প্রগতিশীল লেখক এস ওয়াজেদ আলী, যিনি মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিকে সমর্থন করেননি, বিভাগ পূর্বকালে হিন্দু-মুসলিম যৌথ জাতীয়তাবাদের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তার চোখেও এ জিনিসটা গভীরভাবে ধরা পড়েছিলো। তিনি লিখেছেন–

বিশ্ব মানবতার বড় সমর্থক হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব মানবতার বিষয় নিয়ে যত লিখেছেন, আর কেউ বোধ হয় তত লেখেননি। তাঁরই লেখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে একদল দেশপ্রেমিক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছেন। আর তারা ইসলামী সভ্যতাকে বাঙ্গালা দেশ থেকে তাড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং হিন্দু ও মোসলেম সভ্যতার সমন্বয় করে নতুন একটা কিছু গড়বার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এসব করেছেন। তিনি অশেষ কষ্ট করে ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে যাচ্ছেন হিন্দু কালচারের পুনরুত্থানের জন্য; পটরাজের পালা লিখেছেন, বাঙ্গালী ছেলেদের হিন্দু পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্য বেদমন্ত্র পাঠে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু

AnyScanner

আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য। যে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখতে দশবার তাতে উপনিষদের উল্লেখ করতে ছাড়েন না, তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে আমাদের সমাজের কতিপয় সাহিত্যিক ইসলামিক কালচারের শত্রুতা সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

এই সেই দিন মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ভারতে, মিশনারীদের তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করতে দেবেন না। কারণ, তাঁদের নিজস্ব ধর্মবাদই ভারতবাসীর পক্ষে যথেষ্ট। হিন্দুরা তাঁদের জাতীয় কালচারের প্রয়োজন কতটা অনুভব করেন, রবীন্দ্রনাথের এবং মহাত্মা গান্ধীর সাধনা ও উক্তি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। হিন্দু সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য আজ সমস্ত হিন্দু সমাজ উঠে পড়ে লেগেছেন। হিন্দু যে ভবিষ্যৎ ভারতীয় কালচারের স্বপ্ন দেখেন, তা লুপ্ত হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নহে।[৫৭] এইভাবে হোসেন শাহের বাংলা যেভাবে বাংলাভাষীদের একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল, ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা তার উল্টো দিকে হাঁটলো এবং বাংলাভাষীদের বিচ্ছিন্ন করে দিলো।

সাত

মুসলমানী আমলে যে বাংলাভাষা গড়ে ওঠেছিলো এবং তাকে কেন্দ্র করে যে বিশাল পুঁথি সাহিত্যের ভাণ্ডার তৈরি হলো, যেখানে হিন্দু মুসলমানের যৌথ শরীকানা ছিলো, যদিও উভয়ের মধ্যে ভাষাগত একটা প্রভেদ ছিলো পলাশীর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর বাংলার সেই ধারাবাহিকতাকে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খতম করে দেয়া হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন–

> *যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হয়ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।*[৫৮]

ফলস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ামের কল্যাণে বাংলাভাষা রাতারাতি সংস্কৃতের দুহিতা হয়ে উঠলো। এই ভাষায় সাহিত্য রচনায় অগ্রণী হলেন মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার, রাম রাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে নতুন বাংলা নিম্নরূপ ধারণ করলো–

*কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লক্ষণ উচ্ছলিত শোকাবেগের সম্বরণপূর্বক সীতার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। চৈতন্য সঞ্চার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষণকে বলিলেন, বৎস, ধৈর্য অবলম্বন কর, আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব - যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন।*[৫৯]

এ ভাষার ভিতরে এক ধরণের দীপ্তি আছে সত্য, কিন্তু এটি জনগণের ভাষা ছিলো না। দেবভাষা দিয়ে আমজনতার বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানের রুচি মেটার সম্ভাবনা তেমন ছিলো না। এই ব্যাপারটি বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ জি এ গ্রিয়ারসন (G.A. Grierson) খেয়াল করেছিলেন এবং সেকালেই মন্তব্য করেছিলেন–

*Literary Bengali as now known is the product of the present century. Its direct cultivators were calcutta pandits who, however, well meaning has ruined the language by their learning.*[৬০]

কালের বিচারে এই পণ্ডিতী বাংলারও রূপ বদলে গেছে ঠিক। কিন্তু কাঠামোটাতো ঐ ফোর্ট উইলিয়ামেরই সেটি অস্বীকার করবার জো নেই। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে সে ভাষা অনেক সাবলীল ও সহজ হয়েছে সন্দেহ নেই। নজরুল, ফররুখদের হাতে পড়ে সেই ভাষা আবার কিছুটা মুসলমানী রূপও পেয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়নি। এটা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাম্প্রতিক কালের লেখকও স্বীকার করেছেন–

*উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিলো আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ইংরেজ এসেছে, তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা রীতি তাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বেই জনসাধারণের সাথে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে আজও তা সমান্তরাল সরল*

AnyScanner

*রেখার মতোই চলছে। আজ যখন বাঙ্গালী লেখকের [illegible] স্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে তখন সে অভিযোগের [illegible] নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়, দেড়শো বছর আগে [illegible] নববিধানও যে তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাও [illegible] সময় এসেছে।[৬১]*

পণ্ডিতী বা সংস্কৃত বাংলার বিষয়ে বাঙ্গালী হিন্দুরাও [illegible] দেখিয়েছেন। এ দিক দিয়ে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ [illegible] আত্মীয় প্রমথ চৌধুরী। বেদান্তের অনুবাদ প্রসঙ্গে রামমোহন [illegible] 'বাংলা সংস্কৃতির অধীন'। প্রমথ চৌধুরী এই অধীনতার বিরুদ্ধে [illegible] বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন অধীনতাটা অভিধানের, [illegible] নয়। তিনি লিখেছিলেন 'অন্যান্য জীবের মতো ভাষার [illegible] আশ্রয় করে থাকে, কিন্তু তা তার দেহাকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, [illegible] দেহের পরিচয় তার অভিধানে এবং গঠনের পরিচয় ব্যাকরণে। [illegible] বাংলার এবং সংস্কৃতের আকৃতিগত মিল থাকলেও জাতিগত কোনো [illegible] মিল নেই। প্রথমটা হচ্ছে Analytic ভাষা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে Inflectional ভাষা। সুতরাং বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতির অনুরূপ গড়ে তোলবার [illegible] করে আমরা বাংলা ভাষার জাতি নষ্ট করি। শুধু তাই নয়, তার [illegible] করার উপক্রম করি।[৬২]

বাংলা ভাষা সংস্কৃতির দুহিতা এই মতও প্রমথ চৌধুরী বাতিল করেছে[ন]। তিনি মনে করেন বাংলা ভাষা সংস্কৃতির দুহিতা, দৌহিত্রী কোনোটাই ন[য়]। বাংলা মাগধী প্রাকৃতের বংশধর।[৬৩] এটা প্রমথ চৌধুরীর একটা দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সেকালে সবাই গ্রহণ করেনি। তার সমসাময়িক মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলার সমর্থক। [illegible] তার কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার, এমনকি মুসলমানি [illegible] নিয়েও কবিতা লিখেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ক্লাসরুমে মুসলমান ছেলেদের উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর সুরে বলতেন মুসলমানের কালচার হচ্ছে এগ্রিকালচার। তাদের লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। তিনি ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন–

*এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে [illegible] বলিতে হইবে যে জন্ম হিসেবে বাঙ্গালী এক জাতি কিন্তু ভাব বিচারে*

> সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপাদান সংস্কারের দ্বারা সে স্বত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলা ভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায় তাহাও প্রকৃত বাংলা নয়- বারো আনা সংস্কৃত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে এক অপূর্ব মুসলমানী ভাষা তৈরি হয়। এটা মুসলমানী আমলের ভাষার ধারাবাহিকতার দান। এই ভাষাই পুঁথি সাহিত্য। একে দোভাষীও বলা হয়ে থাকে। কারণ এতে আরবী-ফারসী শব্দের মিশাল আছে। হিন্দু সাহিত্যিকরা এটিকে বটতলার পুঁথি হিসেবে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু এটি ছিলো সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা। এর ভিতর দিয়েই সেদিন তারা তাদের কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও জীবন ভাবনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। যেহেতু ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা তাদের কাছে অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ঠেকেছে, তাই তারা এই ভাষার আশ্রয় নিয়েছে। এই ভাষাকে জেমস লং বলেছেন মুসলমানী বাংলা, হ্যালহেড বলেছেন debased Bengali আর সুকুমার সেন বলেছেন ইসলামী বাংলা। অথচ এই বাংলা আধুনিক সময়েও প্যারীচাঁদ মিত্র কৃত আলালের ঘরের দুলাল-এর মতো সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। যে বাংলা বঙ্কিম নেননি কিন্তু কিছুটা প্রশংসা করেছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আরও উল্লেখ করেছেন, "ভাষার পার্থক্য মানসিক পার্থক্যের সৃষ্টি করলো কিনা সে সম্পর্কে এখানে কোনো মতামত দেয়া সঙ্গত হবে না।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গত মনে না করলেও একধরনের মানসিক পার্থক্য সেদিন তৈরি হয়েছিল। বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা আড়ষ্ট মনে হলেও এতে তাদের কোনো সাংস্কৃতিক দূরত্ব তৈরি হয়নি। কেননা, ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলায় তাদের সংস্কৃতির রূপই ফুটে ওঠেছে। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেনি। ভাষা যেমন তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। এর মধ্যে বিধৃত সংস্কৃতিও তাদের অজানা ছিলো। তাই তাদের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া হয়েছে বেশি। ঔপনিবেশিক বাংলায় এই সংস্কৃত বাংলাই ছিল স্কুল কলেজের পাঠ্য। এ ভাষা তারা আসলেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। অনেকেই তাদের সন্তান-সন্ততিদের স্কুলে পাঠাতে অসম্মত হয়েছেন। সেদিন মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষার প্রতি যে এক ধরনের উদাসীনতা

AnyScanner

তৈরি হয়েছিলো তার কারণ হচ্ছে এটি। বাঙ্গালী মুসলমানের মনোভাব কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ আমলা উইলিয়াম হান্টার। তিনি তার ইন্ডিয়ান মুসলমানস গ্রন্থে লিখেছেন—

> *The language of our government schools, in lower Bengal is Hindu and the masters are Hindus. The Musalmans with one consent spurned the instruction of their boys through the medium of this language of idolatry.*[৯]

বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন ও ঐ ভাষায় মুসলমানের সংস্কৃতির অনুপস্থিতি যে তাদেরকে বাংলার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিলো এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে মধ্য যুগের মুসলমান সাহিত্যব্রতীরাতো বাংলার প্রতি এই উদাসীনতা দেখাননি। এমনকি তারা ভাষা প্রেমের দিক দিয়ে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে তারা বলেছিলেন, যারা বঙ্গদেশে থেকে বঙ্গভাষার প্রতি আগ্রহ দেখায় না তাদের এ দেশ ত্যাগ করা উচিত। অথচ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা হয়ে গেল সাহিত্যের ভাষা কিন্তু মুসলমানের কথ্য বাংলা বা ব্যবহারের বাংলা ব্রাত্য হয়ে পড়লো।

তাছাড়া নতুন কালপর্বের বাংলা গড়ে ওঠেছিলো কতকটা ইংরেজী শিক্ষিতদের হাতে। ইংরেজরাই মুসলমানের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলো। এই কারণে ধর্মের-সংস্কৃতির হানি হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, কিছুটা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার কারণে, কিছুটা দারিদ্রের কারণেও তারা ইংরেজি চর্চায় পিছিয়ে গেল। নতুন পরিস্থিতিতে ইংরেজি শিক্ষা যেহেতু হিন্দুরাই ভালোমতো অর্জন করলো এবং ইংরেজেরও ভালোমতো প্রশ্রয় পেলো আর ইংরেজি জানাদের হাতেই যেহেতু গড়ে উঠলো আধুনিক বাংলা সাহিত্য, সে কারণেই মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণরাই হলেন এই ভাষার নির্মাতা। ঔপনিবেশিক বাংলায় বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সমাজের প্রাথমিক অনাগ্রহ এই পরিস্থিতির পরিণাম এবং তার যৌক্তিক কারণও ছিলো।

এইভাবে ময়দান থেকে যখন মুসলমানরা সরে গেলো, তখন ইংরেজি জানা হিন্দুরা ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার অবারিত সুযোগ পেলো। এই অবস্থায় পুরো বাংলা [illegible] দ্বারা

তলিয়ে গেল। আর যতই হিন্দু ধর্মীয় ভাব এসে ধরা দিল, রামায়ণ-মহাভারত-উপনিষদ ও পুরাণকে আশ্রয় করে সাহিত্য তৈরি হলো ততই বাঙ্গালী মুসলমানের মন এর থেকে উঠে গেল। এক সময় সাড়ে তিনশো বইয়ের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল মুসলমান রচিত মৌলভী আবদুল করিম এমন একটি বাংলা পাঠ্য পুস্তক পাননি যা নিশ্চিতভাবে তরুণ মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়া যায়। শহীদুল্লাহর আক্ষেপ আরও মর্মান্তিক–

> *কি পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম, শ্যাম, গোপালের গল্প পড়িতে হয়। সে পড়ে গোপাল বড় ভালো ছিলো। কাশেম বা আব্দুল্লাহ কেমন ছেলে, সে তাহা পড়িতে পায় না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ বপিত হয়। তারপর সে তাহার পাঠ্যপুস্তকে রাম লক্ষ্মণের কথা, কৃষ্ণার্জ্জুনের কথা, সীতা সবিত্রীর কথা, বিদ্যাসাগরের কথা, কৃষ্ণকান্তের কথা ইত্যাদি হিন্দু মহাজনদিগেরই আখ্যান পড়িতে থাকে। সম্ভবত তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোট জাতি, আমাদের মধ্যে বড়লোক নেই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে জাতীয়ত্ববিহীন করা হয়। হিন্দু বালকগণ ওই সকল পুস্তক পড়িয়া মনে করে আমাদের অপেক্ষা বড় কেহ নয়। মুসলমানরা নিতান্ত ছোট জাত। তাহাদের মধ্যে ভালো লোক জন্মিতে পারে না। এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদ করা হয়।..... মূল পাঠ্য ইতিহাস সম্বন্ধে ওই কথা। তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনী চারি পৃষ্ঠা আর হযরত মোহাম্মদের এর জীবনী অর্ধ পৃষ্ঠা মাত্র। অথচ ক্লাসে একটি ছাত্রও হয়তো বৌদ্ধ নহে। আর অধিকাংশ ছাত্র মুসলমান। ....মূল পাঠ্য ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে অগৌরবজনক কথা প্রায় ঢাকিয়া ফেলা হয়। আর মুসলমানদিগের বেলা ঢাক ঢোল বাজাইয়া প্রকাশ করা হয়। গুণের কথা বড় একটা উল্লিখিত হয় না। ফল দাঁড়ায় এই ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া ছাত্ররা বুঝিল মুসলমান নিতান্ত অপদার্থ, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর জাতি। পৃথিবী হইতে তাহাদের লোপ হওয়াই মঙ্গল।*[৬৩]

বাংলা ভাষায় হিন্দুত্বের এই প্রকোপের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের মনে সংশয় দেখা দিল এই বাংলা কি তার চিরচেনা মাতৃভাষা? ১৩১০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় নবনূর পত্রিকায় লেখা হলো বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুদিগের মাতৃ

AnyScanner

ভাষা। আমার সংসার জীবন রচয়িতা ইবনে মাজুদ্দীন আহমদের
ভাষা তাও কতকটা সংস্কৃত প্রভাবিত তিনিও লিখেছিলেন 'খুঁটি
পরিহিত মুসলমান যেমন, তেমনি তৎসম শব্দবহুল বাংলা সমান

বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনে
দিকে যেসব সাহিত্যব্রত কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন তার মধ্যে
ছিলেন পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ। তিনি নিজেও সমসাময়িক
প্রয়োজনে সংস্কৃত বাংলা লিখেছেন। কিন্তু ঐ সংস্কৃত বাংলার
ইঙ্গিত করে *হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা* গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন-

> *উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মুসলমানগণ জাতীয় অবহীন
> কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতো, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালাদেশে
> মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মুসলমান জাতি
> সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তা বিহীন, নিস্তেজ
> দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।..... বঙ্গের প্রায় সাড়ে তিন কোটি
> মোসলমান সংস্কৃত বা প্রাকৃত মূলক বাঙ্গালা লইয়া একেবারে মাটি*

*ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় (জানুয়ারি ১৯৩০) সম্পাদক এমন সংশ
প্রকাশ করেন যার ভিত্তি তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এ
এরকম নজির অতীতের ইতিহাস থেকে তিনি নিজেই টেনেছেন-

> আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার আলোচনা এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে
> আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িব। তাহা হইলে
> কালে বৌদ্ধদিগের ন্যায় আমাদিগের অস্তিত্ব হিন্দুদিগের মধ্যে বিলীন
> হইয়া যাইবে।[৬৮]

আমাদের দেশের সেক্যুলার ভাবুকরা তাদের লেখালেখিতে বাঙ্গালী
মুসলমানের সেদিনের উর্দু প্রীতি নিয়ে অনেক ব্যঙ্গোক্তি করেন। কিন্তু
রাজনৈতিকভাবে পরাজিত সাংস্কৃতিকভাবে বিধ্বস্ত মুসলমান তার আত্ম-
পরিচয়ের জন্য উর্দু, আরবীর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। যেহেতু সমসাময়িক
বাংলা সাহিত্যে তার সংস্কৃতি ছিল অনুপস্থিত, বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই
যে মুসলমানরা ওরকম করেছিল তা এইসব অসূয়া প্রবণ সেক্যুলার
বাদীরা বিবেচনা করতে রাজি নন।

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) ছিলেন বিশ শতকের প্রথম দিককার কবি। তিনি অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ডালি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি লিখেছেন-

> কোনো তর্ক বা তকরীরের ভিতর না গিয়ে খোলসা করিয়াই আমি বলতে চাই, প্রয়োজনমত আরবী-ফারসী শব্দ আমরা ব্যবহার করিবই। কারণ ওসব শব্দ আমাদের 'ধর্ম' ও সংস্কৃতির প্রতীক, অতএব বর্জন অসম্ভব।.....

আরবী-ফারসী শব্দের খুব ব্যবহার আমরা করি না, কিন্তু যা ব্যবহার করি তাও অপ্রয়োজনে নয়। তিনি আরও যোগ করেছেন-

> উর্দু সাহিত্যের নিকট মুসলিম বাঙলা যে ঋণী একথা বলিতে গেলেই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু এই রূপ অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো হেতু নাই। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা হোক এ চিন্তা আমরা করি না। আমাদের মাতৃভাষা চিরদিন বাঙলাই থাকিবে, উহার পরিবর্তন অসম্ভব। অবচেতন মুসলিম বাংলা উর্দু-সাহিত্যের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়াই যে জাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিল সে কথা অস্বীকার করিয়া কোনো লাভ নাই। এখনো বাঙলার বাহির হইতেই আমাদের মধ্যে প্রেরণা আসে। এসব প্রেরণা যাহারা যোগান তাহাদের মাতৃভাষা উর্দু। সাহিত্যের ভিতর দিয়া একদিন উর্দুভাষী মুসলমান বাংলাদেশে আসিয়া পৌত্তলিক ভাবাপন্ন মুসলমানদের আবার তওহীদের পথে ফিরাইয়া নিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা না আসিলে মুসলমানের অধিকাংশ হয় হিন্দু অন্ত্যজ জাতিতে নয় খ্রিষ্টানে পরিণত হইত। ..... ধর্মীয়, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে আমাদের তরুণদের কিছু উর্দু শিখা উচিত।[৯]

এই বক্তব্যের ভাষা অনেক দৃঢ় ও আত্ম-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার উন্মুখরতা এতে অনেক বেশি। উনিশ শতকে মুসলমানের কণ্ঠ তেমন শোনা যায়নি। কারণ তখন তারা ছিল বৃত্তের বাইরে। বিশ শতকে এসে যতই তারা রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে শুরু করলো, ততই তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে উজ্জ্বলতর করবার প্রয়োজন হলো। সৈয়দ এমদাদ আলী এই সময়কার প্রতিনিধি। সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে যে ভাষা পার্থক্যের প্রয়োজন হয় এটা ফুটে ওঠেছে সৈয়দ এমদাদ আলীর

AnyScanner

সমসাময়িক সিলেটের একজন বাঙ্গালী মুসলিম সাহিতব্রতীর কণ্ঠে, ১৯৩৭ সালে সিলেটে মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে মৌলভী দেওয়ান মোহাম্মদ আহরার চৌধুরী বিএ বিদ্যাবিনোদ বলেন- আমাদের মুসলিম সমাজে মাতৃভাষা লইয়া কোনো বিরোধ নাই। এমন নির্বোধ কে আছে যে বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিবে না, কিন্তু আসল বিরোধই বাঙ্গালার কালচারের ভাষা লইয়া। বাঙ্গালা ভাষা নিশ্চয়ই আমাদের মাতৃভাষা, কিন্তু বর্তমানে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও কাব্য উপন্যাসের বিদ্যাসাগরী রাবীন্দ্রিক বাঙ্গালাকে আমরা কখনও নিজের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যে ভাষায় আল্লাহ, রসুল, নামায, রোজার নাম গন্ধ নাই, যে ভাষায় তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত হইলেও পাঠক মুসলিমের প্রাণ স্পর্শ করিবে না সে ভাষা কখনো আমাদের মাতৃভাষা হইতে পারে না। ইহাকে আমাদের বিমাতৃভাষা বলা যাইতে পারে। আমি আধুনিক বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালাকে আমাদের বিমাতৃভাষা বলিয়া থাকি। বিমাতা যেমন সৎ পুত্রের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের ভাষা কর্তৃপক্ষও ঠিক সেইরূপ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পরীক্ষক বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'কখনো বিশুদ্ধ বাংলা হইবে না' বলিয়া আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের অপরাধে প্রবাসী যদি ইহাকে মক্তবের ভাষা ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'মুসলিম বাংলা' বলিয়া বিদ্রুপ করিতে পারিলেন, তবে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমরাও কেন টোলের বাংলা, হিন্দুয়ানী বাংলা, পণ্ডিতী বাংলা, ভট্টাচার্যের বাংলা, শূদ্রের বাংলা প্রভৃতি হরেক রঙ্গের বাঙ্গালা বলিতে পারিব না? আরবী-ফারসী শব্দকে রায় বাহাদুর ডা. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যদি 'যবনাধিকারের চিহ্ন' বলিতে পারিলেন, তবে সংস্কৃত শব্দকে 'কাফির অধিকারের চিহ্ন' বলিলে সেন মহাশয়ের কাছে কেমন লাগিবে? তারপর মধ্যপ্রদেশের ডাঃ মুঞ্জের ভাষার অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলার কবি রবীন্দ্রনাথ মুসলিম বঙ্গকে ধমক দিয়া বলিলেন- 'আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয় তবে তারা বাংলা ত্যাগ করিয়া উর্দু গ্রহণ করিতে পারেন।' এই কথায় ডা. রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত হিন্দু মানসিকতা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ

AnyScanner

বিশ্বমানবতার বিমানে চড়িয়া যখন আকাশে ভ্রমণ করিতেন, তখন তিনি সকল দেশের সকল সমাজের, কিন্তু যখন তিনি এই সাম্প্রদায়িকতার ধুলাবালি পূর্ণ পৃথিবীতে আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন তখন তিনি আর বিশ্বপ্রেমিক রহিলেন না; হইয়া গেলেন হিন্দু প্রেমিক ও হিন্দু কবি। তিনি বোধ হয়- এখনো উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু যুগে ঘুমাইয়া আছেন। আমরা তাহাকে জানাইয়া বলিতেছি, আজ বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গলা সাহিত্য মুসলিমের। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী বলিতে তুর্কী ও আফগানের ন্যায় মুসলিমকেই বুঝাইয়া থাকে। তিনি যদি মুসলিমের আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন বরদাস্ত করিতে না পারেন তবে নিজেই বাংলা সাহিত্য ত্যাগ করিয়া বিশ্বভারতী আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন।

সেই ভাষণে মি. শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic, the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as bondage of slavery.

মৌলভী আহরার চৌধুরী কতকগুলো আরবী শব্দের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে বলেন,

*"ঈশ্বর, ভগবান, পূজা, তর্পণ, অবতার, জন্মান্তর প্রভৃতি শব্দের ভিত্তির উপর হিন্দু ধর্ম ও দর্শন প্রতিষ্ঠিত। এই সকল পৌত্তলিকতাপূর্ণ ও শিরক ভাবাপন্ন শব্দ মুসলিম সাহিত্যে কখনো প্রচলিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ, রাসুল, নামাজ-রোজা, হজ, যাকাতের কোনো প্রতিশব্দ আর কোনো ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আল্লাহর প্রতিশব্দ বা অনুবাদ ঈশ্বর ও god দ্বারা হইতে পারে না। আল্লাহ এক, তাহার কোনো শরিক নাই, তাহাকে কেহ জন্ম দেয় নাই ও তিনি হইতেও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর ও god এর আবার স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচন আছে, যথা- ঈশ্বরী, God, goddess, ঈশ্বরের আবার ছোট-বড় আছে- যথা, পরমেশ্বর, মহেশ্বর প্রভৃতি। কিন্তু আল্লাহ শব্দের এইরূপ কোনো দোষ-ত্রুটি নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। রাসুল, হজ, যাকাত ও মসজিদের অনুবাদ ভাববাদী*

AnyScanner

*তীর্থযাত্রা, দান ও মন্দির দ্বারা হইতে পারে না। রোজার বদলে উপবাস হইতে পারে না। কারণ উভয়ের সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রোজার নিয়ত করা ফরজ: এবং ছোবহে সাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কেহ খানাপিনা করিতে পারে না। কিন্তু একজন নিয়ত না করিয়া সমস্ত দিন উপবাস করিলেও রোজা হইবে না। একাদশীর উপবাসের নামও উপবাস, দুর্ভিক্ষের সময় ভাত না খাইয়াও যে উপবাস তাহাও উপবাস। সুতরাং রোজা ও উপবাস এক হইতে পারে না। এই সকল শব্দের অনুবাদ কোনো প্রকারে গুজামিল দিয়া চালাইলেও ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল, আজান ও একামতের প্রতিশব্দ বাহির করা অসম্ভব।"*

মৌলভী আহরাব চৌধুরী আরও বলেন,

*"কোরআন শরীফের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক জনাব মৌলভী আব্বাছ আলী ছাহেব হামদ-এর অনুবাদ প্রশংসা ও না'বুদুর অর্থ 'পূজা করিতেছি' লিখিয়াছেন। এখানে আরবী হামদ-এর অনুবাদ প্রশংসা দ্বারা হইতে পারে না। আরবী হামদ বাঙ্গলায়ও হামদ রাখিতে হইবে। কারণ বাঙ্গালায় এক প্রশংসা ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। কিন্তু আরবীতে প্রশংসারও শ্রেণি-বিভাগ আছে। যথা- হামদ, নাত ও মাদাহ প্রভৃতি। আল্লাহ তায়ালার জন্য যে প্রশংসা করা হয় তাহা হইল হামদ, হযরত রসূলে করিমের (দ.) জন্য যে প্রশংসা তাহা হইল নাত; বাদশাহ ও উমরাগণের জন্য যে প্রশংসা তাহা হইল মাদাহ। হামদের আভিধানিক অর্থ প্রশংসা হইলেও ইসলামী সাহিত্যে ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। না'বুদুর অনুবাদ পূজা করিতেছি হইতে পারে না। কারণ পূজা শব্দের সহিত পৌত্তলিকতার ভাব সংশ্লিষ্ট আছে।*[৭০]

এ বক্তব্যের ঝাঝ আরও অনেক বেশি। কারণ মুসলমান মধ্যবিত্ত তখন অনেক এগিয়েছে। আর তার সাংস্কৃতিক শক্তিও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি প্রগতিশীল বলে পরিচিত মোতাহের হোসেন চৌধুরীও এসব যুক্তির সারাংশ উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন–

*বাংলা ভাষা থেকে আরবী-ফার্সী বিতাড়ন-ষড়যন্ত্র আজকের সৃষ্টি নয়। বহুপূর্বেই মিশনারীদের সহায়তায় বাংলা গদ্য সৃষ্টির কালে*

> তার উৎপত্তি। তখন কোনো সংস্কৃত পণ্ডিত আরবী ফার্সী শব্দ দূর করে বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের মতলবটা ধরতে পারা তখন হিন্দু নেতাদের সাধ্য হয়নি। তারা সরলভাবে মনে করেছিলেন ওটা হিন্দু প্রেম ও মুসলিম বিদ্বেষ প্রসূত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা যে আত্মপ্রেম সঞ্জাত – বহুপূর্বেই দূরদর্শী ইংরেজ দেশের মধ্যে যে সকল আত্মকলহের বীজ উপ্ত করেছিলেন, ওটি যে তাদেরই অন্যতম এ সত্যটি হিন্দু নেতাগণ তখনো বুঝতে পারেননি, এখনো বুঝতে পারছেন না।'[১১]

আবার একটু উনিশ শতকে ফেরা যাক। প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে আসার লড়াইয়ে ব্যস্ত তখন বাঙ্গালী মুসলমানরা। সাহিত্যের জগতেও তারা শরীকানা চায়। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক হচ্ছেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। তার বিষাদ সিন্ধুর ভিতর দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত বাঙ্গালী মুসলমান নিজের স্বপ্নের উচ্চারণ শুনতে পেয়েছিল। এ উপন্যাসে বিবৃত শোকাবহ ঘটনার সাথে বাঙ্গালী মুসলমান সেদিন তার ভাগ্য বিপর্যয়ের বেদনাকে মিলিয়ে দেখেছিল। বিষাদ সিন্ধু উপন্যাস জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে সেদিন বঙ্কিমের আনন্দমঠের চেয়ে কম কিছু ছিলো না। তবে বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক ঝাঝ এখানে অনুপস্থিত। মীরের ভাষা কোমল, রুদ্র নয়। ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলায় তিনি লিখেছিলেন। কারণ ওই বাংলার ভুবনে তার স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। ওটা ছাড়া সেদিন বাঙ্গালী মুসলমানের সামনে কোনো বিকল্প ছিলো না। কিন্তু মীর সেটা সেদিন করেছিলেন তা হচ্ছে বিষাদসিন্ধুর মর্মবস্তু শহীদে কারবালার মতো পুঁথির কাহিনী থেকে আহরণ করেছিলেন। ভাষা একটু দূরের হলেও এর সংস্কৃতি বাঙ্গালী মুসলমানের অপরিচিত ছিলো না। এই কারণে বিষাদ সিন্ধু সেদিন বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলো।

বিষাদ সিন্ধুর ভাষা দেখে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চমকে ওঠেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'এই লেখকের ভাষায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাওয়া যায় না'। পেঁয়াজ-রসুন বলতে তিনি সেদিন যাবনী মিশাল ভাষাকেই বুঝিয়েছিলেন। মীরের জমিদার দর্পণ পড়ে বঙ্কিম মন্তব্য করেছিলেন :

AnyScanner

মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্ন ইহাতে নাই। এবং অনেক হিন্দুর লিখিত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।

এটি প্রশংসার যেমন প্রশংসা তেমনই একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব পরিচায়কও বটে। এখানে ধরেই নেয়া হচ্ছে পরিশুদ্ধ (সংস্কৃত) বাংলা মুসলমান লিখতে পারে না। আর অপরিশুদ্ধ বাংলা মানে মুসলমানি বাংলা। সেকালে যেমন সৌম্যকান্তি বাঙালী মুসলমান কিশোর বা যুবাকে যেমন বাঙালী (হিন্দু) বলেই বিবেচনা করা হতো। বাঙালী যেন ও যা কিছু বাঙালীর ব্রান্ড তা একমাত্র হিন্দুরই একমাত্রিক সম্পত্তি, তা কোনো মুসলমান ছেলে সৌম্য কান্তি হতে পারে না।

মীর চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে যথেষ্ট উদার ছিলেন। সেকালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিবারণের জন্য তিনি মুসলমানদের গরু কোরবানী স্থগিত করে অন্য পশু কোরবানীর অনুরোধ করেছিলেন। এই মীরের চোখেও হিন্দুর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটা এড়িয়ে যায়নি। তিনি তার পত্রিকা হিতকরী'তে লিখেছেন–

> হিন্দুয়ানী মতে কাগজ না হইলে, হিন্দুপ্রধান বঙ্গে বাঙ্গালা কাগজের আদর নাই। একটু ব্রাহ্মবাদ অর্থাৎ একেশ্বরবাদিত্ব কাগজে প্রকাশ করিলেই মোড়ক খুলিয়া দেখা দূরে থাকুক ডাক-হরকরা হস্তে দিতে আসিলে ছুঁইলে জাত যাইবে ভাবিয়া দু-দশ হাত তফাৎ সরিয়া পড়েন।[৩৩]

মীর 'হিন্দুপ্রধান বঙ্গ' বলেছেন সংস্কৃতির দিক বিবেচনা করে, কারণ মুসলমানরা তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু পাঠক ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের, যারা মুসলমান পরিচালিত পত্রিকা পাঠ করলে জাত যাবে ভেবে ওর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকা পছন্দ করে। মীর আরো লিখেছেন–

> পাগল সাজাইতে মুসলমান, আহাম্মক প্রমাণ করিতে হইলে মুসলমান, গালাগালি দিতে হইলেও মুসলমান। ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে।[৩৪]

এরকম অভিযোগ মাওলানা আকরম খাঁও করেছেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত মোহাম্মদী পত্রিকা ডাকে গ্রামের মুসলমানদের ঠিকানায় পাঠাতেন। কিন্তু পোস্টম্যান সেটা মুসলমান বাড়ির বাইরে নিক্ষেপ করে চলে যেত। পরে ডাক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো হলে এটির সমাধান হয়।

অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোনো হীনমন্যতা ছিলো না। বরং তিনি বেশি উৎসাহিতদের বাংলায় সাহিত্য সাধনা করতেন।

একই রকম বাঙালি সাহিত্যিক মহাকবি কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) বেলায়। তিনি আরও এগিয়ে বললেন মুসলমানরা বাংলা ভাষায় এটা বোঝে সেটা কঠিন। ১৯৫০ এ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অভিনন্দনে কায়কোবাদ বলেন

> আমি এইসব অবমাননার বোঝা মাথায় লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মুসলমান লেখক বাংলা লিখিতে জানে কিনা তাহা এই হিন্দু বাবুদিগকে দেখাইতে হইবে। এই চিন্তা করিয়াই আমি 'অশ্রুমালা' লিখিয়াছিলাম। ইহাতে এমন একটি শব্দ ছিল না যাহা পাঠ করিয়া হিন্দু যুবকগণ মুসলমানের লেখা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন। এমনকি ইহা পাঠ করিয়া সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা বঙ্গবাসী লিখিয়াছিলেন, "মুসলমান হইয়া শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না।..... বিক্রমপুর পল্লী সমাজের মুখপাত্র 'সাপ্তাহিক পত্র' লিখিয়াছিলেন, কবি কায়কোবাদ মুসলমান, কিন্তু তাহার বাঙ্গালা মুসলমানী নহে। কায়কোবাদের বাঙ্গালা সুসংস্কৃত, মার্জিত ও মধুর।"

এখানেও একই রকম ধারা। মার্জিত, মধুর মানেই হিন্দুয়ানী হওয়া জরুরী। আগে সাহিত্যের ভিতরে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তারপর রাজনীতিতে সংক্রমিত হয়েছে। কায়কোবাদের আমল থেকে স্পষ্ট হচ্ছে ঔপনিবেশিক আমলে ধীরে ধীরে বাঙালী মুসলমান তার আত্মহীনতার জায়গা থেকে আত্মমর্যাদার জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। আর এই চেষ্টার ভিতর দিয়ে তার বাংলা ভাষা নিয়ে সংশয় কাটতে শুরু করেছে।

এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) বিশ শতকের প্রথম দিককার লেখক। অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তার বাংলা। লেখার বিষয়বস্তু ইসলাম ও বাঙালী মুসলমান। তিনি লিখেছেন—

> তবে এক বিষয়ে আমাদের ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রতিষ্ঠা করা সর্বতোভাবে প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই

> আসল কথা। বাঙালা ভাষার যে সমস্ত শব্দ আমাদের ধর্মমতে বিরুদ্ধ ভাব সংশ্লিষ্ট তাহা আমরা কখনও ব্যবহার করিব না; পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ আমাদের জাতীয় ভাব প্রকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে আমরা তৎপরিবর্তে আরবী বা পার্শী শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিব।”

মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ছিলেন উঁচু মাপের আলেম, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালী মুসলমানের দ্বিধামুক্তির সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে:

> বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহৃত হইবে।”

তবে ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা বাঙালী মুসলমানের মননে বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছিলো, তাকে আত্মপরিচয়ের সংশয়ে ফেলে দিয়েছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধাক্কাটা শুধু বাঙালী মুসলমান সাহিত্যব্রতীরা অনুভব করেননি, তখনকার মুসলিম সমাজনেতা ও রাজনীতিবিদরাও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।

সেকালের মুসলিম নেতা নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) প্রস্তাব করেছিলেন, উর্দুভাষী মুসলমানদের জন্য উর্দু ভাষা আর বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষার কথা। তবে বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য তিনি সংস্কৃত'র মিশাল দেয়া বাংলার বাইরে আরবী-ফারসী মিশাল দেয়া বাংলার কথা বলেছিলেন।

বাঙালী মুসলিম নেতা সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ছিলেন বিশ শতকের প্রথম দিককার বড় মাপের রাজনীতিবিদ। রাজনীতিতে তিনি নওয়াব সলিমুল্লাহর সহযোগী ও মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল নওয়াব সলিমুল্লাহর পরেই। বিভিন্ন সময় সর্বভারতীয় মঞ্চে বাঙালী মুসলমানের স্বার্থকে তিনি তুলে ধরেছেন। চৌধুরী সাহেব যথেষ্ট সংস্কৃতিমনাও ছিলেন এবং বাঙালী মুসলমান কর্তৃক পরিচালিত সেকালের অনেক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য বিষয়ে মুসলমান সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলা ভাষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন

ফোর্ট উইলিয়ামের দেব ভাষা থেকে বাঙ্গালী মুসলমানকে মুক্ত করা এবং বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রভাব বাড়ানো। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তার লিখিত পুস্তিকা *The Vernacular Education in Bengal*-এ মন্তব্য করেছিলেন, বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের পক্ষে পুরোপুরি গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি, কারণ এই সাহিত্যে মুসলমানের জীবন অনুপস্থিত। ১৯০৮ সালে করাচিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে প্রস্তাব করেন মুসলমান ছাত্রদের সমস্যা হয় সেকারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হোক যাতে বাংলায় বাধ্যতামূলক পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী অবশ্য সংস্কৃত মিশাল দেয়া বাংলার কথাই বলেছেন, যে ভাষার পাঠ্যবইয়ে ইসলাম ও বাঙ্গালী মুসলমান নেই। এবং ওটা সহ্য করাও কঠিন।

*The Mussalman* পত্রিকার সম্পাদক মজিবুর রহমান যিনি মুসলমান হয়েও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একজন ছিলেন, তিনি লিখেছেন–

> *The Bengali books, we may observe, are full of references to Hindu mythology and as such there can hardly be anything in them of interest to the Mussalman.*[৭৮]

সেকেলের আরেকজন বাঙ্গালী মুসলিম নেতা স্যার আবদুর রহিমের (১৮৬৭-১৯৫২) মতামতও একই রকম। তিনি রীতিমতো বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে (১৩ মার্চ, ১৯২৬) ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। কেননা, বাংলা চালু করলে It would weaken the teaching of English particularly for the Muslims to whom the teaching of English is more important than Bengali.

তিনি আরও যোগ করেন স্কুলে যে বাংলা পড়ানো হয় ওটা খাঁটি বাংলা নয়। কেননা বাংলার মুসলমানরা ঐ  ভাষায় কথা বলে না এবং ঐ ভাষা বাংলার মুসলমানদের সংস্কৃতির সহায়ক নয়।[৭৯]

স্যার আব্দুর রহিমের পর বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ভাষায় তিনি ছিলেন, 'মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বাঙ্গালী'। এই ফজলুল হকও স্যার আব্দুর রহিমের

AnyScanner

মতো স্যাডলার কমিশনের সামনে দেয়া সাক্ষাৎকারে [illegible] [illegible] ইংরেজি প্রবর্তনের কথা বলেছেন :

> *English should be used at the medium of instruction in secondary schools for those students who are being prepared for the Matriculation,and the process should begin at as early stage as possible.*[৮০]

শুধু তাই নয়, ফজলুল হক সাহেব ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে (All India Muslim Education Conference) সভাপতির ভাষণে হিন্দির পরিবর্তে উর্দুকে ভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) রূপে গ্রহণের প্রস্তাব করেন।[৮১]

একই সময়ে বাঙ্গালী মুসলমান নেতা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) বাঙ্গালী মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য আরবী হরফে বাংলা চালু করার কথা ভেবেছিলেন। জিন্নাহ যে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় উর্দুকে পাকিস্তানের Lingua Franca হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন তা কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা অপরিকল্পিত চিন্তার ফসল ছিল না। এটা ছিল দীর্ঘ ইতিহাস এর পরম্পরার ফল। হিন্দুয়ানী বাংলা ও মুসলমানী বাংলার মধ্যে তফাৎ তো আছেই, এটা অস্বীকার করা অসম্ভব। সেটা মধ্য যুগে ছিলো, ফোর্ট উইলিয়ামের যুগে এসে সে রকমই ছিল এবং আজ অবধি প্রবহমান আছে। হাল জামানায় প্রকাশিত দুটি অভিধানের তুলনা করলেই সেটা বুঝা যায়। ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে* এমন সব আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যা পশ্চিম বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান* এ নেই। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে এগুলোর চল আছে কিন্তু পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে তা নেই। এই দুই ভাষার মধ্যে তফাৎ হয়েছে ধর্মীয়-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভাষা-সাহিত্যে একটা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারা এগিয়ে গেছে। সব ক্ষেত্রে মাত্রা এক না হলেও ভাবের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও সাযুজ্য আছে। বিপরীতে মুসলিম জাতীয়তাবাদও মাথা তুলেছে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিকূল রাজনীতির কারণে প্রথমদিকে মুসলমানরা

AnyScanner

দাঁড়াতে না পারলেও ধীরে ধীরে তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদের নিশান খাড়া করেছে এবং সেটা সংস্কৃতির ভেতর দিয়েই।

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার ভাষা যে একরকম নয় এ কথাটা সমন্বয়বাদী রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরও বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রাজনীতির পাকিস্তান চাননি, কিন্তু সংস্কৃতির পাকিস্তানকে হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন:–

*হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ভাষার খানিকটা তফাৎ যে আছে সে কথা মানতেই হবে। অন্য পক্ষে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, সমাজের রীতি-নীতির মধ্যেও অমিল অনেক। এর কোনটি কারণ, এবং কোনটি ফল, সে প্রশ্ন তোলার এখন কোনো দরকার নেই। তবে একথা বলা চলে যে, ভাষার আচার-অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে পার্থক্য আছে বলে বিশেষভাবে হিন্দু বা মুসলমান সাহিত্য রচনারও খানিকটা সম্ভাবনা রয়েছে।.....*

*বাংলা ভাষায় তাই মুসলমান সাহিত্য গড়বার অবকাশ আছে, প্রয়োজন আছে। তার ফলে ভাষারও রূপ খানিকটা হয়তো বদলাবে, কিন্তু তাতে খেদ করবার কিছু নেই। কারণ ভাষার ঐশ্বর্য ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাও তাতে বাড়বে। আর এক দিকেও তাতে বাংলা ভাষার লাভ। বাংলার অর্ধেকের বেশি লোক মুসলমান, কিন্তু তারা আজও নিজেদের যোগ্য দান বাংলা সাহিত্যে আনেনি। তার জন্য বাংলা ভাষার সংস্কৃত রূপ যে অনেকখানি দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলা যদি সংস্কৃতের মোহ ছেড়ে আবার খাঁটি বাংলা হয়, তবে বাংলার মুসলমানের সংস্কারও অনেকখানি ঘুচবে– তাদের সাহিত্য-সাধনা আনন্দে এবং সহজ বিকাশে ভরপুর হয়ে উঠবে।*[৮২]

পশ্চিমবঙ্গের শক্তিমান কথা সাহিত্যিক দেবেশ রায় সাম্প্রতিক কালের মানুষ। কিন্তু তিনিও গত শতকের হুমায়ুন কবিরের প্রতিধ্বনি করেছেন বলা চলে–

*ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে বলেই বলতে পারছি যে, বাংলাদেশের বাংলার গঠনের বনেদটাই আলাদা। এমন একটা শ্লেষ্মা ভরা ... শুনতে আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না যে,*

> ওপারে যে-বাংলা এপারেও সেই বাংলা। বা দুই দেশ এক ভা… বা একই রকম আরও নানা কথা। ভারতীয় ইউনিয়নের বাংলা ও… বাংলাদেশের বাংলা একটি মাত্র মাত্র ভাষা নয়।....”[৮]

এক ভাষা নয় বলে ভাষা বৈরিতা তৈরি হয়েছে। বৈরিতা থেকে তৈরি হয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনার এবং সেই পথ ধরেই স্বত… জাতীয়তাবাদের। একটি দৃষ্টান্ত দেই।

এটা প্রায় জানা কথা বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ কবি জসীমউদ্দীনকে কোনোভাবেই মতাদর্শিকভাবে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। এক উদার মানবিক চেতনা সব সময় তার কবিতার শরীর জড়িয়ে থাকে। অথচ এই জসীমউদ্দীনও রেহাই পান না প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে। আধুনিক বাংলা কবিতা ও জসীমউদ্দীন- প্রসঙ্গ নকশী কাঁথার মাঠ শিরোনামে এক নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের অপর এক মননশীল লেখক শিবনারায়ণ রায় এ ব্যাপারে এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ টেনেছেন। প্রসঙ্গটি যে কেবল ব্যক্তি বা কবি জসীমউদ্দীন সংশ্লিষ্ট নয় সে কথা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে পরিস্ফুট। শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন–

> আমাদের সময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট অবশ্যপাঠ্য বাংলা সংকলনে ওই কবিতাটি (কবর) অন্তর্ভুক্ত ছিল।..... অবশ্য পাঠ্য কবিতা সকলে সাধারণত সহজেই বিস্মৃত হয়। কিন্তু আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে 'কবর' কবিতাটি আমার চেতনায় গভীর দাগ কেটেছিলো। কিন্তু আমাদের যিনি বাংলা শিক্ষক ছিলেন তিনি ক্লাসে এই কবিতাটি পড়াতে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।..... তিনি বললেন, কর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান দেখ–পড়বে হিন্দু ছেলেরা, পড়াবে হিন্দু শিক্ষক, আর বিষয় কি? নাম কবর! তোরা কি কখনও কবর দেখেছিস, না দেখবি? তারপরে দ্যাখ কি ভাষা! কোনো অভিধানে এসব বিজাতীয় শব্দ পাবি?.....আমাদের তো সবই গেছে, এবার মোছলমানরা আমাদের ভাষাটারও দফারফা করবে।..... ইংরেজরা এ-দেশ থেকে চলে গেলে কি যে দশা হবে আমাদের।”[৯]

ভাষার বিরোধ যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল একথা পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের চোখ এড়ায়নি। শুধু তাই নয়, ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন

দ্বন্দ্ব মনন সৃষ্টি করে চলেছে সেটিও তিনি দৃকপাত না করে বলে ফেলেছেন—

> আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশ যেহেতু হিন্দুদের হাতে, সেইহেতু তার শৈল্পিক কাঠামোতে যত তথাকথিত হিন্দুয়ানী থাক, কোনো মুসলিম লেখককে সাহিত্যে হাত পাকাতে হলে তা স্বীকার করেই কলম ধরতে হবে। মজার কথা এতে কেউ আপত্তি তুললেও তার লেখা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তিনি ওই তথাকথিত হিন্দুয়ানীকে নিজের অগোচরেই অনুসরণ করে ফেলেছেন। তার মানে, আমি বলতে চাইছি, বাংলা সাহিত্য-নকশা, বাংলা ভাষার বাগধারা, আঙ্গিকের বিন্যাস সবকিছুতেই উত্তরাধিকারসূত্রে একজন মুসলিম লেখক সবকিছুতেই ওই হিন্দুয়ানীটা লাভ করেছেন। এবং ওই জিনিসটাকে ভারতীয়তা বলে না মেনে আমাদের পার নেই।”

ভাষার ক্ষেত্রেও বিরোধ ছিলই। সেটা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ শব্দ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের কলহের কারণ হয়ে ওঠেছিল। যেমন বাংলা ভাষায় খুন শব্দটা ব্যবহার করা যাবে কিনা এই নিয়ে সাহিত্যিক মহলে এক সময় তুমুল ঝড় ওঠেছিল। এই কলহের জন্ম হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) খুন শব্দটি তাঁর কবিতায় এমনি ভাবে ব্যবহার করেছিলেন: উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। কাজীর অসাম্প্রদায়িকতা, উদারতাবোধ নিয়ে কারোরই সংশয় থাকার কথা নয়। ঐ খুন শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন কবিতায় রস সৃষ্টির জন্যই। কিন্তু এই যাবনী মিশাল শব্দ ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন, তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ। কাজীকে তখন রবীন্দ্রের অভিযোগের জবাব দিতে হয়েছিল, *বড়র পীরিতি বালির বাঁধ* নামের বিখ্যাত প্রবন্ধে। এই কলহের দিকে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী জামাই প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা'। এই মামলা আজও ডিসমিস হয়নি। মহাকালের রায়ের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।

ভাষার বিরোধ সংস্কৃতিতে যেয়ে পড়লো অথবা সংস্কৃতি ভাষাকে প্রভাবিত করলো এবং সেই পথ ধরে জাতীয়তাবাদও পৃথক হয়ে গেলো। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন

*ওপারে যে-বাংলা এপারেও সেই বাংলা। না দুই দেশ এক ভাষা, বা একই রকম আরও নানা কথা। ভারতীয় ইউনিয়নের বাংলা আর বাংলাদেশের বাংলা একটি মাত্র মাত্র ভাষা নয়।....”*

এক ভাষা নয় বলে ভাষা বৈরিতা তৈরি হয়েছে। বৈরিতা থেকে তৈরি হয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনার এবং সেই পথ ধরেই স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের। একটি দৃষ্টান্ত দেই।

এটা প্রায় জানা কথা বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ কবি জসীমউদ্দীনকে কোনোভাবেই মতাদর্শিকভাবে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। এক উদার মানবিক চেতনা সব সময় তার কবিতার শরীর পেঁচিয়ে থাকে। অথচ এই জসীমউদ্দীনও রেহাই পান না প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে। *আধুনিক বাংলা কবিতা ও জসীমউদ্দীন- প্রসঙ্গ নকশী কাঁথার মাঠ* শিরোনামে এক নিবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের অপর এক মননশীল লেখক শিবনারায়ণ রায় এ ব্যাপারে এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ টেনেছেন। প্রসঙ্গটি যে কেবল ব্যক্তি বা কবি জসীমউদ্দীন সংশ্লিষ্ট নয় সে কথা নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে পরিস্ফুট। শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন–

> *আমাদের সময়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট অবশ্যপাঠ্য বাংলা সংকলনে ওই কবিতাটি (কবর) অন্তর্ভুক্ত ছিল।..... অবশ্য পাঠ্য কবিতা সকলে সাধারণত সহজেই বিস্মৃত হয়। কিন্তু আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে 'কবর' কবিতাটি আমার চেতনায় গভীর দাগ কেটেছিলো। কিন্তু আমাদের যিনি বাংলা শিক্ষক ছিলেন তিনি ক্লাশে এই কবিতাটি পড়াতে গিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।..... তিনি বললেন, কর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান দেখ–পড়বে হিন্দু ছেলেরা, পড়াবেন হিন্দু শিক্ষক, আর বিষয় কি? নাম কবর! তোরা কি কখনও কবর দেখেছিস, না দেখবি? তারপরে দ্যাখ কি ভাষা! কোনো অভিধানে এসব বিজাতীয় শব্দ পাবি?.....আমাদের তো সবই গেছে, এবার মোছলমানরা আমাদের ভাষাটারও দফারফা করবে।..... ইংরেজরা এ-দেশ থেকে চলে গেলে কি যে দশা হবে আমাদের।”*

ভাষার বিরোধ যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল একথা পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের চোখ এড়ায়নি। শুধু তাই নয়, ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন

হিন্দু মনন সৃষ্টি করে চলেছে সেটিও তিনি লুকোছাপা না করে বলে ফেলেছেন—

*আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশ যেহেতু হিন্দুদের হাতে, সেইহেতু তার শৈল্পিক কাঠামোতে যত তথাকথিত হিন্দুয়ানী থাক, কোনো মুসলিম লেখককে সাহিত্যে হাত পাকাতে হলে তা স্বীকার করেই কলম ধরতে হবে। মজার কথা এতে কেউ আপত্তি তুললেও তার লেখা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তিনি ওই তথাকথিত হিন্দুয়ানীকে নিজের অগোচরেই অনুসরণ করে ফেলেছেন। তার মানে, আমি বলতে চাইছি, বাংলা সাহিত্যে-লবজ, বাংলা ভাষার বাগধারা, আঙ্গিকের বিন্যাস সবকিছুতেই উত্তরাধিকারসূত্রে একজন মুসলিম লেখক সবকিছুতেই ওই হিন্দুয়ানীটা লাভ করেছেন। এবং ওই জিনিসটাকে ভারতীয়তা বলে না মেনে আমাদের পার নেই।*[৮৫]

ভাষার ক্ষেত্রেতো বিরোধ ছিলই। সেটা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ শব্দ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের কলহের কারণ হয়ে ওঠেছিল। যেমন বাংলা ভাষায় খুন শব্দটা ব্যবহার করা যাবে কিনা এই নিয়ে সাহিত্যিক মহলে এক সময় তুমুল ঝড় ওঠেছিল। এই কলহের জন্ম হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) খুন শব্দটা তার কবিতায় এমনি ভাবে ব্যবহার করেছিলেন : উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার। কাজীর অসাম্প্রদায়িকতা, উদারতাবোধ নিয়ে কারোই সংশয় থাকার কথা নয়। ঐ খুন শব্দটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন কবিতায় রস সৃষ্টির জন্যই। কিন্তু এই যাবনী মিশাল শব্দ ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন, তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাচ্ছ। কাজীকে তখন রবীন্দ্রের অভিযোগের জবাব দিতে হয়েছিল, *বড়র পীরিতি বালির বাঁধ* নামের বিখ্যাত প্রবন্ধে। এই কলহের দিকে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী জামাই প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা'। এই মামলা আজও ডিসমিস হয়নি। মহাকালের রায়ের অপেক্ষায় মুলতবি আছে।

ভাষার বিরোধ সংস্কৃতিতে যেয়ে পড়লো অথবা সংস্কৃতি ভাষাকে প্রভাবিত করলো এবং সেই পথ ধরে জাতীয়তাবাদও পৃথক হয়ে গেলো। আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন

(১৮৯৭-১৯৭৮), সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯২০-১৯৯৫) এই নতুন জাতীয়তাবাদের কণ্ঠস্বর। এরা শব্দে ও ভাষায় হিন্দু জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেননি। ১৯৩০-৪০ এর দশকে রাজনীতিতে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্বনি শোনা গেল, সংস্কৃতিতে এরা তার প্রতিধ্বনি করলেন। এদের পথ নতুন কিন্তু ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়। ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলার দিকে ইঙ্গিত করে এরা সাফ জানিয়ে দিলেন, এ সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়, এর বিষয়বস্তুও মুসলমানী নয়। এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়, এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।[৮৬]

১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি যে জরুরী তার উপর জোর দেয়া হয়। এটা অস্বাভাবিক ছিল না। ইতিহাসই ঠিক করে দিয়েছিলো তার রাস্তা। ফোর্ট উইলিয়ামের বিভেদ পন্থা সাহিত্যে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করেছিল। রেনেসাঁ সম্মেলন তার একটি পরিণতি মাত্র, কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রেনেসাঁ সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব ওঠেছিল পরবর্তীকালে তার পাকিস্তান আমলের বাংলা ভাষা বিষয়ক সংস্কার চেষ্টার সাথে একটা মিল দেখা যায়। কারণ আদর্শের মধ্যে কোনো অবিচ্ছিন্নতা ছিলো না। আদর্শটা ছিলো একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। আর সে কারণে একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতিরও প্রয়োজন ছিল। রেনেসাঁ সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সেই সংস্কৃতির একটি রূপ খাড়া করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা তারা গোপন রাখেননি। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তার বক্তৃতায় স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের ভিতর রেনেসাঁ আনার কথা বলেন। পুঁথি সাহিত্যকে তিনি ভিত্তি করতে চেয়েছেন। কিন্তু ওর পুনর্বহাল চাননি। কারণ–

পলাশীর বিপর্যয়ের পরে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এ-যাবৎ ভুল পথেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। প্রথমে আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তনের উৎকট প্রয়াস করেছিলাম। আমাদের সে চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী সত্যকার আজাদীর কথা – রেনেসাঁর কথা নয়। সে ব্যর্থতার পরে আমরা

AnyScanner

গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ। পরের দেখানো পথে আজাদী মেলে না। আমরা ভুল পথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।..............

সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজস্ব পুঁথি সাহিত্য ও লোক সাহিত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছুদিন বিজাতীয় উর্দুভাষার মোহে কাটিয়েছি। তারপর শুরু হল অনুকরণের পালা। সে অদ্ভুত কসরত এখনো চলছে। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়। পুঁথি ও লোকসাহিত্যে পুরাপুরিভাবে প্রত্যাবর্তনে সে স্বচ্ছতা, স্বকীয়তা আসবে না। কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা, রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্যিক কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে।[৬৭]

এরা পিছনে ফিরতে চাননি। রেনেসাঁও পিছনে ফেরার কথা বলে না। কিন্তু তারও একটি ঐতিহাসিক বুনিয়াদ থাকতে হয়। ইউরোপের রেনেসাঁ সামনের কথা বলেছিল। কিন্তু তার ঐতিহ্যের শিকড় পোঁতা ছিলো সেই গ্রিকো-রোমান কালচারের মাটিতে। কলকাতার এই রেনেসাঁ সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। অসাধারণ এই মেধাবী মানুষটি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। সংস্কৃতি বিশ্লেষক হিসেবে তার স্থান খুব উঁচুতে সন্দেহ নেই। জীবনের শুরুতে তিনি কৃষক প্রজা পার্টি করেছেন। পরে মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করেছেন এবং জেলও খেটেছেন। রাজনীতি করতে যেয়ে তিনি মন্ত্রী হয়েছেন। পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ পরিসরে কিন্তু তার সংস্কৃতি চিন্তার মধ্যে একচুলও নড়চড় হয়নি। এই সম্মেলনে বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতি সম্পর্কে তার মতামত শুধু লক্ষণীয় নয়, ভাববার মতো :

*ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাত নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়, এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরাই বা মুসলমানরাই কি এক*

AnyScanner

> একটা আস্ত জাত? অথবা তাদের সংস্কৃতি এক-একটা আস্ত সৃষ্টি? তা নয়। আরবী, তুর্কী, ফারসী, আফগানিরা এক মুসলমান হয়েও এক জাত নয়। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, জার্মান এক খ্রিষ্টান হয়েও এক জাত নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। গাছ ও বীজ এর মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কও তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম। বীজ থেকেই গাছের জন্ম। গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে: সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়: ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে: কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না, বরঞ্চ সে-সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পরদায়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ। এইখানেই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা, এইজন্যই পূর্ব পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।[৮৮]

আবুল মনসুর মনে করতেন সাংস্কৃতিকভাবে বাঙ্গালী মুসলমান উর্দুভাষীদের থেকে যেমন আলাদা তেমনি বাঙ্গালী হিন্দু থেকেও আলাদা। আবুল মনসুরের এই ভাবনার মধ্যে আজকের বাংলাদেশের রাষ্ট্র হয়ে বেড়ে উঠবার একটি যোগসূত্র আছে। বাংলাদেশকে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে হলে আবুল মনসুর যে সাংস্কৃতিক মানচিত্র এঁকেছেন তার বাইরে যাওয়া অসম্ভব কল্পনা মাত্র। সম্মেলনে আবুল মনসুর আহমদ রেনেসাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন–

> রাজনীতিকের বিচারে 'পাকিস্তানের' অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারেল অটনমী, রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জাতি বাঁচতে পারে কিনা সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমুদ্দুনী আজাদী ছাড়া কোনো সাহিত্য বাঁচাত পরের কথা–জন্মাতেই পারে না।[৮৯]

এই কালচারেল অটনমি বা তমদ্দুনী আজাদী বর্তমান বাংলা সাহিত্য দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ : এর সাহিত্য হিন্দু মনীষার সৃষ্টি। সুতরাং স্বভাবতই হিন্দু সংস্কৃতিকে বুনিয়াদ করেই তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা

করেছেন, নইলে তাঁরা জীবন্ত সাহিত্য হতো না। হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু মনীষার সন্তান। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মুনি ঋষির ধর্ম। হিন্দুর সংস্কৃতিও তাই ত্যাগ, প্রেম ও ভক্তিবাদের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির মূলবাদ প্রতীক পূজা। কাজেই হিন্দুর শিল্পী মন সুন্দরের পূজারী। এ কারণে এই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যম শিবম সুন্দরম এর সাধনা। সে সাধনার কামনা হচ্ছে, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে'। সুন্দর ও প্রতীক পূজারী এই রসিক মন স্বচ্ছন্দে আর্টের জন্যই আর্ট এই মতবাদ প্রচার করেছে। প্রতীক পূজারী এই রস পিপাসু মন স্পন্দিত হয়েছে পরকীয়া প্রেমে। 'আত্মার তৃপ্তির জন্য, ভক্তিবাদ ও আর্টবাদের মিল ঘটানোর জন্য রাধা কৃষ্ণ প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে নারী প্রেমকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই সাহিত্যকে মুসলমানরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করে না। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্য, ভক্তি প্রেম যতই উঁচু দরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। হিন্দু ধর্ম যেমন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মুনি ঋষির ধর্ম; মুসলমানের ধর্ম তেমনি হক, ইনসাফ ও জেহাদ-শহীদের ধর্ম। প্রতীকবাদী, সুন্দর পূজারী আর্টবাদী হিন্দু সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতি তেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। হক ও ইনসাফবাদী কল্যাণমুখী মুসলিম সংস্কৃতি তাই সমাজকেন্দ্রিক। মুসলমানের বিচারে তাই আর্ট আর্টের জন্য নয়—আর্ট সমাজের জন্য।[৮০]

এমনকি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েও এই তমদ্দুনী আজাদী অর্জন সম্ভব নয়। এর কারণ হচ্ছে—

> *বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজায় আনন্দময়ী মা এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মোহাররমের চাঁদ উঠেনি। সে চাঁদ উঠাবার ভার ছিলো নজরুল ইসলামের উপর। এতে দুঃখ করবার কিছু নাই। কারণ এটা স্বাভাবিক, কাজেই কঠোর সত্য।[৮১]*

এই তমদ্দুনী আজাদীর প্রেরণা বাঙালী মুসলমান পেতে পারে কিছুটা পুথির ঐতিহ্য থেকে, কিছুটা দেখিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই জন্য তার ভাষায় নজরুল ইসলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি :

> তার বদলে বরঞ্চ সেদিন এক অচেনা অজানা বালক হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলো : বল বীর, উন্নত মম শির। সেদিন রিক্ত ক্লান্ত ঘুমন্ত জীবন্মৃত মুসলমান তড়বড় করে জেগে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে হুংকার দিয়ে উঠলো : উন্নত মম শির। কারণ এ যে তারই অন্তরের ঘুমন্ত শিশুর চিৎকার। এ যে তারই জীবনের কথা। তাই নজরুল ইসলামের আকস্মিক আবির্ভাব মুসলিম সমাজ-মনকে এমন করে আলোড়িত করতে পারছে। মুসলমানের বিবেচনায় মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধার, হাসি-কান্না, তাদের দেবত্ব-পশুত্ব, তাদের মহত্ত্ব-বীরত্ব, তাদের হীনতা-ক্ষুদ্রতা তাদের সংগ্রাম-সাধনা, এসবই সাহিত্যের বুনিয়াদ এবং নজরুল ইসলাম এই জীবনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। শুধু এ কারণেই নজরুল ইসলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি।[৬২]

ওই সম্মেলনে আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে বাঙ্গালী মুসলমানের মুখের ভাষার কথা বলেছেন। তার মতে, এই ভাষা হবে সাহিত্যের ভাষা এবং এই সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ। এর প্রয়োজনে তিনি বাংলা ভাষার বর্তমান অভিধান ও ব্যাকরণও পাল্টে ফেলার পক্ষপাতি। তিনি বলেছেন–

> পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব পাকিস্তান বাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষায় নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা করবে।[৬৩]

এটি অসম্ভব সাহসী বক্তব্য। কিন্তু এ বক্তব্যের পেছনে ছিলো গভীর এক আদর্শের প্রেরণা এবং কওমের প্রতি নিবিড় আকর্ষণের প্রমাণ। এটা ছাড়া এই বক্তব্য দেয়া সম্ভব ছিল না।

ওই সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হয়েছিলেন তরুণ অথচ মেধাবী সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। ইনি ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভাপতিও ছিলেন। ওই সংসদের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবি কোনো নজিরবিহীন ঘটনা নয়। এমনকি একই ভাষার ভেতরেও স্বাতন্ত্র্য চেতনার কারণে সাহিত্যের খাত বদল হয়ে গেছে। ইংরেজি ও আইরিশ সাহিত্যের নজির

তুলে ধরে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন রঙে বর্ণিল করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন–

> *Yeats, যিনি ছিলেন Celtic Revival এর পুরোধা, এক স্থানে বলেছেন, a national drama or literature must spring from a native interest in life and its problems and a strong capacity for life among the people.*
>
> *আমাদের আন্দোলন সম্বন্ধেও Yeats-এর এ উক্তির পুনরাবৃত্তি করা চলে। বাংগালী মুসলমানের ভিতর Yeats, Synge বা O casey-র মতো কবি বা নাট্যকার এর আবির্ভাব অদ্যাপি হয়নি; তবে আমরাও উপলব্ধি করছি যে, আমাদের সাহিত্যের উপজীব্য হবে আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন। যাঁরা বলছেন সাহিত্যে স্বাতন্ত্রের অবকাশ নেই, Celtic Revival-এর সাফল্যই তাঁদের ভ্রান্তি প্রমাণিত করে। Swift অথবা Shaw বিদ্যমান থাকতেও যদি Yeats এবং Synge-এর প্রয়োজন হতে পারে, তবে বাঙালি মুসলমানেরা স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে না কেন?*[১৮]

কয়েক দশক পরে যখন এ অঞ্চলের ভূগোল ও রাজনীতির ভিতরে বড় রকমের তোলপাড় হয়ে গেছে তখনও সাজ্জাদ হোসায়েন বদলাননি। তার বিশ্বাসের নড়চড় হয়নি। এটা স্বার্থের কারণে নয়, হয়েছে আদর্শের প্রেরণায়। সে বিশ্বাসের নাম মুসলিম জাতীয়তাবাদ। তিনি লিখেছেন, বাঙ্গালী মুসলমান তার শিকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে আজও আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে। তিনি মনে করেন–

> *The main cultural weakness of the present generation (or rather the last two generations) of Muslims in Bengal consists in their neglect of classical languages, Arabic and Persian. This has tended to cut them off from the rest of the Muslim community outsides Bengal, to rupture those bonds, subtle and invisible, which sustain a people`s sense of spiritual cohesion.*[১৯]

এটার অর্থ সাজ্জাদের আরবী, উর্দু প্রীতি নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক পরম্পরার ব্যাপার, সেটিকে তিনি হারাতে চাননি। একটি আদর্শের সত্যমূল্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি জিন্নাহর মত পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একসময় উর্দুর পক্ষপাতী ছিলেন। জিন্নাহর মতো তিনি তেমন কিছু ভালো উর্দু জানতেন না। অন্যদিকে বাংলার প্রতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের অনুরাগ মোটেই কম ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের একই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন–

> পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন বাংলা ভাষা হবে এ প্রশ্ন বহুপূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে, এতদিন পরে উর্দু-বাংলা প্রশ্নের উত্থাপন করা পণ্ডশ্রম ও হাস্যকর বলেই বিবেচিত হবে। ভারতের সার্বজনীন ভাষা হিসাবে উর্দুর দাবি অগ্রাহ্য করা নিষ্প্রয়োজন এবং সেই কারণে উর্দু শিক্ষার প্রসারও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু উর্দুকে বঙ্গদেশীয় মুসলমানের সাহিত্যের বাহন করে তোলবার আকাঙ্খা বাতুলতা মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে উর্দু বিদেশি ভাষার সমতুল। এর ঐতিহাসিক পশ্চাদভূমি সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং এর ব্যাকরণ আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। উর্দুর স্থান ভারতে যাই হোক, এই ভাষায় উন্নত শ্রেণির সাহিত্য সৃষ্টি বাঙালি মুসলমানের পক্ষে সম্ভব, সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যার কোনো জ্ঞান আছে তিনিও বিশ্বাস পোষণ করবেন না।

এখানে উর্দুর পক্ষে জিন্নাহ ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের অবস্থান অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের হিন্দির পক্ষে অবস্থান নেয়ার সাথে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ শিল্পী। সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার পণ্ডিত। তবু কেন এরা রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে হিন্দির পক্ষ নিচ্ছেন। সেকালে যেমন হিন্দু পণ্ডিতরা সংস্কৃতের পক্ষে ছিলেন। এর পিছনে আছে অখণ্ড ভারতের আদর্শ, উপনিষদের আদর্শ, তপোবনের আদর্শ। আর আছে কয়েক হাজার বছরের ভারতীয় আদর্শের জোয়ার। যে ইতিহাস ও বিশ্বাস বাংলা ছাড়িয়ে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপি বিস্তৃত। এখানে তারা বাংলার উপর নির্ভর করেছেন না অথচ এরা বাংলারই মানুষ।

জিন্নাহ ও সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়নের ব্যাপারটাও এরকম। একজনের মাতৃভাষা গুজরাটি, অন্যজনের বাংলা। অথচ এরা উর্দুর পক্ষপাতী। কারণ ঐ বিশ্বাস যা বাংলা ছাড়িয়ে, এমনকি ভারত ছাড়িয়েও নিখিল ইসলামী দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত ভাবাদর্শের নাম ইসলাম। অনেকে বলতে পারেন তাহলে তো আরবী হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

AnyScanner

যেমনটি শহীদুল্লাহ বলেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমানরা উর্দুকে কেন্দ্র করে তাদের সংস্কৃতি নির্মাণ করেছিলো। এইজন্যই তো উর্দুর প্রতি পক্ষপাত। বাংলা এর বিকল্প হতে পারতো যদি একে ফোর্ট উইলিয়ামের ধাক্কা সামলাতে না হতো। এখানকার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ করেন জিন্নাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার কথা বলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিমাংশের কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেই কর্তৃত্বের একটি হাতিয়ার হচ্ছে উর্দু ভাষা। সে দিক দিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথও হিন্দির আধিপত্য চেয়েছেন, সুনীতিও চেয়েছেন। এটাকে তাদের হিন্দি প্রীতিও বলা চলে। কিন্তু সমালোচনা করা হয় শুধুমাত্র উর্দুওয়ালাদের, হিন্দিওয়ালাদের নয়। এ হচ্ছে একই যাত্রায় দুইফল। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে ঐ ব্রাহ্মণের রাজনীতি, যা এদেশের মানুষকে চিরকাল প্রান্তে ঠেলে রাখতে চেয়েছে। কেন্দ্রে আসতে বাঁধা দিয়েছে। ব্রাহ্মণরাই এদেশের মানুষকে একসময় পক্ষী বলেছে, বলেছে নেড়ে, বলেছে যবন, এখন বলছে সাম্প্রদায়িক।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ছাত্র সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দু'জনেই ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত এবং উভয়ের যোগ্যতাই প্রশ্নাতীত। কিন্তু গুরু-শিষ্য এক পথে হাঁটেননি। দুজনের দুটি পথ দুটি দিকে চলে গেছে। গুরু বদলাননি শিষ্য বদলে গেছেন।

২০০০ সালে প্রকাশিত *বাঙালির জাতীয়তাবাদ* বইয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার শিক্ষক সাজ্জাদ হোসায়েনের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। কারণ সাজ্জাদ হোসায়েনের মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক। শুধু তাই নয় চৌধুরী রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম উদ্যোক্তা আবুল মনসুর আহমদেরও সমালোচনা করেন। কারণ একটাই। রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনে দেয়া বক্তৃতায় আবুল মনসুর আহমদ দু-চারটি আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, যেমন হাজেরানে মাজলিস, জলসা, মতলব, আজাদী, তমদ্দুন প্রভৃতি। এ সমস্ত শব্দ বাঙ্গালী মুসলমানেরা হরহামেশা ব্যবহার করে থাকে। এটাই তার আপত্তির কারণ। চৌধুরীর এহেন মনোভাবের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ামের ব্রাহ্মণদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ফোর্ট উইলিয়ামের ব্রাহ্মণরা এখন নেই, কিন্তু নতুন ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছে,

AnyScanner

প্রায় চাইতেন। কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণদের মতই আধুনিকতা ধর্মনিরপেক্ষতার সার্বিকতার ক... না হলে মুসলমানী ... নিজেকে এই খড়্গ কৃপাণ নিয়ে নেমে পড়া কেন। চৌধুরী তার বইয়ে ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য বই থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বইটি পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে একটি সাংস্কৃতিক দলিল। মজার ব্যাপার হল এই বইটি সম্পাদনা করেছেন আরেক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সরদার ফজলুল করিম। এখানে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাহিত্যে মু[illegible] নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি শীর্ষক একটা লেখা আছে। এতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে তার ঝোঁক লক্ষণীয়। কিন্তু ১৯৬৮ সালের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০০-এ এসে অনেক ভেঙ্গেছেন, বদলেছেন। এ বদল কি আদর্শ বদলের সাথে যুক্ত না অন্য কোনো স্বার্থে যুক্ত তা বলা করা কঠিন। এদেশের মার্কসবাদীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এরা কখনো শ্রেণি সংগ্রামের রাজনীতি করতে পারেননি। ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘদিনের ব্রাহ্মণ নেতৃত্বের ফলে এদেশের মার্কসবাদ প্রায়শই হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই কারণেই তারা কর্মক্ষেত্রে রাজনীতির ইতিহাস বিশ্লেষণে কংগ্রেসী ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করে আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাতার ব্রাহ্মণরা তাদের আইডল হয়ে ওঠে। একই কারণে রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা জিন্নাহর আগে গান্ধীকে এগিয়ে দেন। গান্ধীর প্রতি তাদের সহানুভূতির পরিমাণটা হয় বেশি। অন্যদিকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঢাকার বাংলাকে রাখেন কলকাতার বাংলার পিছনে। এখানেই মার্কসবাদীদের ট্র্যাজেডি।

আট

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'বঙ্গভঙ্গ একটি মস্ত বড় দুর্ঘটনা, এতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা অসম্ভব।' হতে পারে। কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে বা কোনো লাভ হয়েছে কিনা চৌধুরী তার অবশ্য কোনো ফর্দ দেননি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বিভাজন তো ছিল ইতিহাসের রায়। যে ভাষা নিয়ে আমরা বাঙ্গালীত্বের কথা বলি সেই ভাষা কিন্তু বাঙ্গালীকে ঐক্যবদ্ধ করেনি। ফোর্ট উইলিয়ামের বাংলা জাতীয় বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ঐ ভাষা আমজনতার ভাষা ছিল না। দ্বিতীয়ত ঐ

ভাষা যে সাহিত্য নির্মাণ করেছিল তাতে আত্মসচেতনতার তীব্র স্ফূর্তি ঘটেছিল। জাতীয় ঐক্যের জন্য দেশের সব মানুষের জীবন সমকাল করা। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে একালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ চিত্রের ছবি আমরা দেখি। আমাদের ভাষার মধ্যে বিভাজন যদি দেখিয়েছি ধর্মীয় বিভাজন তো আছেই ছিল। আগেই আলোচনা করা হয়েছে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার ভাষা এক নয়। যদিও একটি বাংলা ভাষায় দুটি বাংলা কথা বলে। যেমন আমেরিকা ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ভাষার মধ্যে কিন্তু দুজনের ইংরেজি এক নয়, দুই ইংরেজিতে বিস্তর ফারাক। তেমনি সকল বাঙালী এক বাংলায় কথা বলে না।

তাই বাঙালীত্বের দাবির মধ্যে কোনো সারবস্তু নেই, এটি একটি নিরেট ফাঁপা বস্তু। বিভাগ পূর্বকালের সওগাত পত্রিকার একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিতে চাই যেখানে দেখানো হয়েছে বাঙালীত্বের অসারতা। সওগাত সেকালের প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে পরিচিত ছিল। আশা করি এটিকে কেউ সাম্প্রদায়িক বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে সওগাতের মন্তব্য।

> আজ আমরা শুধু বিস্ময় ও কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, হিন্দু সমাজের স্বার্থে বাংলা প্রদেশটিকে দ্বিখণ্ডিত করিতেও বাঙালী হিন্দু নেতাদের আপত্তি নাই। অথচ বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই বাঙালী হিন্দুরাই তদানিন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের বাংলাস্থিত বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য কি ভীষণ আন্দোলনই না চালাইয়াছিলেন।..... তারা বলিতে লাগিলেন বাংলা এক ও অবিভাজ্য, তাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাঙালী হইতে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার বৃটিশের নাই।..... আজ দেখা যাইতেছে, সেটা বাঙালী হিন্দু নেতাদের মনের কথা ছিলো না। তখন বাংলায় যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল, তাতে হিন্দুরাই আধিপত্য করিতেন মুসলিমরা পড়িয়া ছিলেন উপেক্ষার আস্তাকুঁড়ে। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে হিন্দুরা এইরূপ প্রাধান্য পান নাই, পাইয়াছিলেন মুসলিমরা। তাই অখণ্ড বাংলার জন্য বাঙালী হিন্দুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। আজ আর সে ব্যবস্থা নাই। বাংলায় আজ মুসলিমরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সংখ্যার দিক দিয়া তাদের এই গুরুত্ব আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে প্রতিফলিত হইতে পারিয়াছে।

সুতরাং বাংলার অখণ্ডত্বের মধ্যে বাঙালী মুসলিমকে আজ যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে হটাইবার উপায় নাই, তখন অন্তত পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র প্রদেশ হইতে কাটিয়া আলাদা করা হোক। কেননা, পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সেখানে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে তাহাদেরই আধিপত্য হইবে। বাংলার অখণ্ড সত্তা রক্ষার জন্য বাঙালী হিন্দু ভ্রাতাদের মাথা ব্যথা হওয়া-না হওয়ার মূল রহস্য যদি এটাই হয়, তা হইলে ভৌগোলিক, সামরিক অর্থনৈতিক নানা বিষয়ক যুক্তি দিয়া আজ যে তারা অখণ্ড ভারতের প্রতি দরদ দেখাইতেছেন, সেগুলির অসারত্ব সহজেই লোকচক্ষে ধরা পড়িবে। আমরা আশা করি, তাঁরা অতঃপর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তান বিরোধী ভণ্ডামি পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগের প্রস্তাব সমর্থন পূর্বক ভারত মাতাকে(?) শান্তি দিবেন।[৩৭]

তাহলে আজও কেন বাঙ্গালীত্বের কথা উঠছে। উঠছে এই কারণে আজও আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ঐ ব্রাহ্মণ্যের আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করেনি। আবুল মনসুর আহমদের মতো মানুষ যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান বদলে ফেলার কথা বলেছিলেন তা কোন ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা ছিলো না। প্রেক্ষাপটও কিছুটা তৈরি হয়েছিলো। তাছাড়া একটি নতুন রাষ্ট্র ও জাতির প্রয়োজনে এরকম ভাষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও ছিলো। দুনিয়ায় এটা কোনো নজিরবিহীন ঘটনা নয়।

রুশ বিপ্লবের পর রুশ ভাষার সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে। সে ভাষা থেকে বুর্জোয়াদের আধিপত্যের ছাঁপগুলো বদলে ফেলার কম চেষ্টা হয়নি। নতুন রুশ সাহিত্যে টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, তুর্গেনিভের চেয়ে এগিয়ে গেছেন গোর্কি, মায়াকোভস্কিরা। শুধু তাই নয় রুশ ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী রুশ প্রজাতন্ত্রের মানুষের উপর এক নিখিল রুশীকরণ পরিকল্পনা নিয়ে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আরমেনিয়া, এস্তোনিয়া, জর্জিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ইউক্রেন তাদের নিজ নিজ জনগণের ভাষাকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে। মুসলিম অধ্যুষিত আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান পূর্বের রুশ প্রভুদের সিরিলিক হরফ পরিত্যাগ করে তুর্কি জাতিগোষ্ঠীগুলো হরফ নিয়ে নিয়েছে। তাজিকিস্তান আরবী হরফ বেছে নিয়েছে। বেশি

দূরে যাওয়ার দরকার নেই, উত্তর ভারতের একই হিন্দুস্তানী ভাষা সংস্কৃতির তফাতের কারণে উর্দু ও হিন্দিতে ভাগ হয়ে গেছে। উর্দু আরবী-ফারসী শব্দবহুল, হিন্দি সংস্কৃতবহুল। উর্দু নিয়েছে মুসলমানরা, হিন্দি হিন্দুরা। বিদ্বেষের তীব্রতা কতদূর হয়েছিল তার প্রমাণ হচ্ছে বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক কৃষণ চন্দর ও মুন্সি প্রেম চাদ প্রথমে উর্দুতে লিখতেন। পরে উর্দু ছেড়ে দিয়ে হিন্দিতে লেখা শুরু করেন।

জওহরলাল নেহরু যে হিন্দুস্তানীতে কথা বলতেন তা ছিল উর্দুর কাছাকাছি। ইকবালের কবিতার প্রতিও ছিল তার এক ধরনের অনুরাগ। দীর্ঘদিন মোঘল দরবারের সাথে সম্পৃক্তির ফলে তার পূর্বপুরুষদের উপর মোঘল সংস্কৃতির একটা ছাপ পড়েছিল। নেহরুর পোষাক-আসাকে সেটা স্পষ্ট। নেহরু নিজেও সেটা স্বীকার করেছেন। তারপরেও তো নেহরু রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে হিন্দির পথে হেঁটেছেন। কেন তিনি হিন্দির পথে গেছেন এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মোহাইমেন :

> *তিনি যখন ১৯১২ সনে সানইয়াৎ সেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য চীনে যান তখন তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, চীনের উত্তর অঞ্চল মানচুরিয়া থেকে দক্ষিণে পানকিং পর্যন্ত এ সাড়ে তিন হাজার মাইলের বিরাট দেশে সমস্ত মানুষই চীনা ভাষায় কথা বলে, যদিও উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে উচ্চারণের স্থানীয় কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য সত্ত্বেও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এ বিরাট দেশের লোক একজনের কথা আরেকজন সহজে বুঝতে পারে। এর ফলে এই বিরাট দেশের মানুষগুলোর মধ্যে একটি অখণ্ড জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে, যেটা ভারতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চীনের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, হায়-রে আমার ভারত বর্ষ– সেখানে বাঙালি গুজরাটির ভাষা বুঝে না, গুজরাটি আবার মারাঠীদের ভাষা বুঝে না, মারাঠি আবার তামিলদের ভাষা বুঝে না। তারা প্রত্যেকে একজন থেকে আরেকজন সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র জীবনযাপন করছে। কারও মধ্যে ভাষার বিভিন্নতার কারণে চিন্তার দিক থেকে কোন ঐক্যবোধ নেই। এক জাতি হিসেবে নিজেদেরকে এরা চিন্তাই করতে পারে না। চীনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ভারত যদি কখনো স্বাধীন হয় তবে*

এই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলোকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য ভাষাই হবে একমাত্র বন্ধন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে খুব সম্ভব তাঁর এ মনোভাবই কাজ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন হিন্দি যেহেতু কোনো বিশেষ প্রদেশের ভাষা নয় কিন্তু ভারতের সব প্রদেশের লোকই এটা মোটামুটি বুঝতে পারে তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষগুলোকে এক ভারতীয় জাতি হিসাবে গড়ে তোলার মানসে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সেক্ষেত্রে আবুল মনসুররা যে মুসলমানী বাংলার পক্ষে দাঁড়াবেন তা কোনো অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু মুশকিল হলো বাঙ্গালী মুসলমানরা তখনও অপরিণত। একটি সুসংস্কৃত শক্তিমান মধ্যবিত্ত তখনও তাদের মধ্যে দৃশ্যমান হয়নি। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক বঞ্চনা ও নিপীড়ন অবশ্যই এর একটি কারণ। তুলনায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্তের যে ধারা তা অনেক সৃষ্টিশীল, প্রাণবন্ত। জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এদের স্পষ্টতা বেশি রকম দৃশ্যমান। অখণ্ড ভারতের আদর্শ নিয়েও এদের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। এ কারণেই বাঙ্গালী হিন্দু স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে বাঙ্গালী মুসলমানের দ্বিধামুক্তি ঘটেনি। কারণ ঔপনিবেশিক ফোর্ট উইলিয়াম প্রবর্তিত বাংলা ভাষা তাকে দ্বিধায় জড়িয়ে রেখেছে, হীনমন্যতাও সৃষ্টি করেছে। এই ভাষার কারণে সে রবীন্দ্রনাথকে, শরৎচন্দ্রকে, বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজের ঐতিহ্যের অংশ মনে করতে চায়। কিন্তু বিশ্বাসের কারণে ধর্মের কারণে, রাজনীতির কারণে সে পিছিয়ে আসে। তার এক হাত টানে ঔপনিবেশিক বাংলা, আরেক হাত টানে ধর্ম। এই ভাষা ও ধর্মের টানাটানি তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। তাই একই বাংলাদেশে বাস করেও বাঙ্গালী ও বাংলাদেশীর লড়াইয়ে তারা আজো ম্রিয়মান।

সেদিন আবুল মনসুর আহমদরা যা বলেছিলেন তার সত্যমূল্য গ্রহণ করার প্রস্তুতি বাঙ্গালী মুসলমানের পুরোপুরি ছিলো না। আজও কি আছে, সন্দেহ হয়। কায়েদে আযম ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ঢাকায় উর্দুর কথা বলেছিলেন। বাঙ্গালী মুসলমানের [illegible] [illegible] এই বাঙ্গালী মুসলমানই [illegible]

কয়েকদিন আগে তার নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছে এবং বলা হয়ে থাকে বাঙ্গালী মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান হাসিল হয়েছিল।

ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন এবং মূল সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) যা বলেন তা এই দ্বিধারই উচ্চারণ :

> *আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-শাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।*[৯৯]

দ্বিধা ব্যাপারটা মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবন থেকে দৃশ্যমান হয়। এই বক্তৃতা দেয়ার আগে তার একটি বক্তব্য এবং পরের আরেকটি বক্তব্য থেকেই এটা পরিষ্কার হবে। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান যে একজাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার কথা ক্ষোভের সাথে বলেছেন শহীদুল্লাহ :

> *ইউরোপের যেখানে গিয়াছি, যে কোনও হোটেলে থাকিতে পারিয়াছি, যে কোন রেস্টুরেন্টে যাহা ইচ্ছা খাইতে পারিয়াছি........ কাহারও কিছু আপত্তির কারণ নাই। বিদেশে যে সামাজিক সুযোগ বা সুবিধা ভোগ করিয়াছি, আমার মাতৃভূমিতে তাহা দুষ্প্রাপ্য। আমার অপরাধ আমার ধর্ম বা বর্ণ। এই সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবিধান না হইলে, কেবল মুখে মুখে ভাই ভাই বলিলে কি ভ্রাতৃভাব আপনি জাগিয়া উঠিবে? হরিজনদিগের জন্য হিন্দু মহাত্মা গান্ধী প্রাণপণ করিয়াছেন। আল্লাহজনদিগের জন্য কি কোনও ভারতীয় উদারাত্মা চেষ্টিত হইবেন না?* To know is to love. *আমরা প্রতিবেশী সম্প্রদায় পরস্পরকে জানিয়াছি কি?*[১০০]

১৯৪৯ সালে এসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আবার লিখেছেন :

> *আমার ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধু ডক্টর সুনীতিকুমার তাঁর কুমিল্লা অভিভাষণে*

করিয়াছেন, সেখানে আমি সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাই না। সুনীতি বাবু বলেন, একশ্রেণীর লেখক হিন্দু-বিদ্বেষ ফলে বাঙলা ভাষায় দেদার আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করছে। আরবী-ফারসী শব্দের আমদানি যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তবে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কি বলব না মুসলমান-বিদ্বেষ বশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা?[১০১]

এই যে শহীদুল্লাহর দোদুল্যমানতা, কোনো একটি বিশ্বাসে স্থির না থাকা, বাঙ্গালী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের দিকে বারবার হেলে পড়া ও দিক পরিবর্তন করা এটা কি শুধু তার ব্যক্তি হিসেবে বৈশিষ্ট্য না পুরো বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্তের চরিত্র এটা ভাবার বিষয়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন, হিন্দু পণ্ডিতরা সেখানে ঢুকতে দেয়নি। কোনো ম্লেচ্ছকে তারা বেদ-উপনিষদ পড়াবে না। সেজন্য তার সংস্কৃত পড়া হয়নি। লেখাপড়া শিখবার পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চাকরিও হয়নি। চাকরি হয়েছে মুসলমান অধ্যুষিত ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর। শহীদুল্লাহ একবার বাঙ্গালী মুসলমান ছেলেদের নাম বাংলায় রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। যেমন আজকের বাঙ্গালীবাদীরা করে থাকেন। এতে সেকালের কবি আশরাফ আলী খান চৌধুরী কৌতুক ভরে তার নামকরণ করেছিলেন আচার্য বলিরাম। আচারে-পোষাকে শহীদুল্লাহ অনেকটা মোল্লা-মৌলভীদের মতোই ছিলেন। নামাজ পড়তেন, মিলাদ পড়াতেন, নিজের ছাত্রীদের মাথায় কাপড় দেয়ার কথা বলতেন, এমনকি নিজের চিত্রশিল্পী পুত্রকে মানুষের ছবি না আঁকবার শক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অথচ এই শহীদুল্লাহর উপর ১৯৪৭-এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমএ ক্লাসের পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি কোনো মুসলমানের লেখা অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করেননি। কাজী নজরুল ইসলামের লেখাও নয়।[১০২]

বাংলা ভাষার ওপর পাণ্ডিত্যে তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর সমতুল্য ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে সুনীতিবাবুর ভিতরে যে স্পষ্টতা দেখি, শহীদুল্লার সেটা ছিল না।

পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন ভাষা-সংস্কারের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই ওঠেছে। কারণ তখন তারা আর ভগবান লিখতে চায়নি।

AnyScanner

লিখতে চেয়েছে আল্লাহ। তার একটা রাষ্ট্রীয়রূপ যে ছিল তাও আমরা রেনেসাঁ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের বক্তৃতায় দেখতে পেয়েছি। পাকিস্তান কবিরা যেমন গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন প্রমুখ এই নতুন সাহিত্যের ভাষা তৈরির চেষ্টা করেছেন এবং এ ভাষাও অত্যন্ত শক্তিশালী। একটা উদাহরণ দেই :

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ!

সিন্দাবাদ - ফররুখ আহমদ

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ঢাকার ফজলুর রহমান বাংলা ভাষার হরফ পরিবর্তন করে আরবী হরফ প্রবর্তন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার অভিমত ছিল :

*আমাদের দেশবাসীর শতকরা মাত্র দশভাগ লেখাপড়া জানে এবং অবশিষ্ট নব্বই ভাগ লিখিতে বা পড়িতে পারে না, হরফ আরবী হোক আর যাই হোক তাহাতে তাহাদের কিছু যায় আসে না।*

এই অভিমতের সত্যতা ছিল। সময় ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আরবী হরফে বাংলা দাঁড়িয়ে যেতে পারতো। নতুন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা না গেলে বাঙ্গালী মুসলমান গভীর এক সাংস্কৃতিক সঙ্কট ও বিপর্যয়ে তলিয়ে যাবে এবং কলকাতার সাংস্কৃতিক দাসত্বে আটকা পড়বে ফজলুর রহমানের মতো নেতারা এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। পরবর্তী ইতিহাসে তার নজীর ভুরি ভুরি। এই কারণে পরবর্তীকালে ফজলুর রহমানকে বাঙ্গালী বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে মানুষটি আজীবন বাঙ্গালী মুসলমানের ভিতরে ও তাদের স্বার্থের পক্ষে রাজনীতি করেছেন, ব্যবস্থাপক পরিষদে যিনি কৃষকের স্বার্থে জমিদারি উচ্ছেদের দাবি তুলেছিলেন, তাকে বলা হচ্ছে বাঙ্গালী বিদ্বেষী। এই খেতাব দিচ্ছেন পূর্ববঙ্গের নতুন ব্রাহ্মণরা যারা কলকাতার ভাষাকে নতুন করে বিজয়ী করতে চাচ্ছেন। ফজলুর রহমানকে এই যে বাঙ্গালী বিদ্বেষী বলা হচ্ছে এর পিছনে আছে ব্রাহ্মণদের সেই ঐতিহাসিক Hate

Politics এবং অনুদার ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চায় যারা। আসলে ফজলুর রহমান পুরো ব্যাপারটা দেখতে চেয়েছেন মুসলিম সংস্কৃতির দীর্ঘ ক্যানভাসে। তার বিরোধীরা দেখেছে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার আয়নায়।

পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিল তমদ্দুন মজলিস। এটি বাংলাকে প্রথম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি তোলে। কিন্তু তমদ্দুন মজলিস কখনো খোলাসা করে বলেনি তারা কলকাতার পণ্ডিতী বাংলা না মুসলমানী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কিন্তু পণ্ডিতী বাংলাই বিজয়ী হয়েছে। মুসলমানী বাংলা ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যে লিবারালিজমের রাজনীতির বাড়-বড়ন্ত হয়েছে তা কিন্তু ভারতবর্ষের সহস্র বছরের মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অনুমোদন করেনি। ভাষা আন্দোলনের রাজনীতি হাজার বছরের বাঙ্গালী নামের এক তত্ত্বের আড়ালে প্রকারান্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে কবুল করে নিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের রাজনীতি ইকবালকে নেয়নি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েছে, গালিবকে নেয়নি বঙ্কিমকে নিয়েছে, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে নেয়নি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কে নিয়েছে।

ওপার বাংলার বাঙ্গালী হিন্দুরা ভাষা আন্দোলন করেনি, তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিও করেনি। যদিও হিন্দি ভাষা উত্তর ভারতকেন্দ্রিক ভাষা, পুরো ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা নয়, তা সত্ত্বেও ওপারের বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি হিন্দির তুলনায় বাংলার সমৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেনি। তাদের চোখের সামনে ছিল কয়েক হাজার বছরের আর্য ভারতের ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের ক্যানভাসে তারা রবীন্দ্রনাথকে, বঙ্কিমকে, সুভাষকে শিবাজীর সাথে, গান্ধীর সাথে, নেহেরুর সাথে একাকার করে দিয়েছে। ওপারের বাঙ্গালী হিন্দুর সাথে সাংস্কৃতিক চৈতন্যের দিক দিয়ে এপারের বাঙ্গালী মুসলমানের এই হচ্ছে তফাৎ।

*নয়*

বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে হলে তার ভাষাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। এটা ছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে

AnyScanner

না। জাতিরাষ্ট্র হিসেবেও এটি হয়ে উঠবে অসম্ভব। আর এর জনগণও আত্মপরিচয়ের সংকটে ধুঁকতে থাকবে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভাষার নাম হবে বাংলাদেশী ভাষা কিংবা বাংলাদেশী বাংলা। যে বাংলার ইশারা আমরা আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কাছ থেকে বিভাগ পূর্বকালেই পেয়েছি। রাজনীতির কারণে ভাষা পাল্টায়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখেছি। ঔপনিবেশিক বাংলায় কলকাতা রাজধানী হওয়ার ফলে বাংলা ভাষা আমূল বদলে গিয়েছিলো। আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য ছিল, সে ভাষার কয়েক দশকের মধ্যে সংস্কৃতায়ন ঘটলো। বিশ শতকের প্রথম দিকে এসে সে ভাষার মোড় কিছুটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মুসলমান সাহিত্যিকরা। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ফলে সে গতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের রাজনীতির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ তৈরি হলেও এখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ মুসলমান। সেই জনসাধারণের মুখের ভাষার প্রভাব সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতই অনুভূত হবে। যতই সাহিত্যের বাংলা থেকে মুসলমানি প্রভাব বিতাড়নের চেষ্টা হোক না কেন জনগণের ভাষাই শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে।

দেশ ভাগের পর কলকাতা হয়ে গেছে প্রাদেশিক রাজধানী। ওখানকার রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি হওয়ার ফলে বাংলার গুরুত্বও কমে গেছে। ওখানে ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্য চর্চার সম্ভাবনাও সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।

অন্যদিকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়ার কারণে বাংলাদেশে বাংলা চর্চা কখনো সীমিত হয়ে পড়েনি। শুধু তাই নয় এখানকার ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক শব্দ মুসলমানি অবদান পুষ্ট হতে থাকবে প্রকৃতির নিয়মেই।

এখনও ঢাকার যে কথ্য বাংলা তা কিন্তু কলকাতার বাংলা নয়। এটা সত্য, এ বাংলাকে নাড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা বরাবর আছে এবং সচেতনভাবে এই প্রক্রিয়াটা আজ অবধি চলছে। ব্রাহ্মণদের হাত এখনো শিথিল হয়নি। তবুও বাংলাদেশে এখন যে বাংলা তৈরি হচ্ছে, তাহলো কয়েকটি জেলার সংমিশ্রণে মিশ্র বাংলা। এ ভাষায় আঞ্চলিক ও মুসলমানী দু'ধরনের শব্দই আছে। যেমন ধরা যাক সৈয়দ শামসুল হকের ... নাটকের ভাষা।

AnyScanner

এ যে কলকাতার বাংলা নয়, পূর্ববঙ্গীয় বাংলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল মাহমুদ যখন সোনালী কাবিনের কাবিন শব্দটি উচ্চারণ করেন তখন এটি যে আশ্চর্য সম্মোহন ও ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, ওটা পশ্চিমবাংলায় করে না। ঢাকার নাটকেও এখন আঞ্চলিক শব্দ দেদার ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমান যে ভাষা তার সঙ্গে কলকাতার বাংলার পার্থক্য শুধু মার্কিন ও ব্রিটিশ ইংরেজির মতো উচ্চারণের নয়, শব্দাবলিরও। আঞ্চলিক ও আরবী-ফারসী শব্দ তাতে অনেক বেশি। এখানকার বাংলায় খোদা হাফেজ বলা হয়, ইনশাআল্লাহ বলা হয়, আব্বা-আম্মা বলা হয়। ওখানকার বাংলায় এটা বলা যায় না। এ পার্থক্য প্রকৃতির মতোই সত্য। জোর করে এ শব্দ লোপাট করা যাবে না। পানি ও জল এক করা সম্ভব নয়।

পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যাকরণও যথেষ্ঠ পরিমাণে আলাদা, বিশেষ করে ক্রিয়া বিভক্তি ও সর্বনামে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ রয়েছে। এমনকি পূর্ববঙ্গের পারিভাষিক ও আভিধানিক শব্দের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ করে যেসব বাক্য তৈরি করা হচ্ছে তা কি এতকাল ভাবা যেত (তুমি আজীবন সদস্য হইবা? আমারে রেজিস্ট্রি কইরা নিকাহ করবা? তোমারে খুব সুন্দর লাগে। আপনের নাম কয়েন? কি কইলা? আয়েন, বসেন ইত্যাদি)। সময়ের সাথে সাথে এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। ধীরে ধীরে কলকাতার উচ্চারণের সাথে আরও দূরত্ব তৈরি হবে। ব্রিটিশ ইংরেজি ও মার্কিন ইংরেজি স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে শব্দের অভিধা ও উচ্চারণে। কালে কালে দুই বাংলার ভাষাতেও তাই হবে। কলকাতায় যে সাহিত্য তৈরি হয় তার মধ্যে আবশ্যিকভাবে থাকে হিন্দু জীবনের প্রতিফলন। আর বাংলাদেশের যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে সেখানে মুসলিম জীবনই প্রাধান্য পায়। এভাবে কালে কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুটি ধারা প্রবাহিত হবে-এমন সম্ভাবনাই উজ্জ্বল।

বঙ্গভঙ্গের কালে রবীন্দ্রনাথ নাকি আশঙ্কা করেছিলেন, দুই বাংলায় অখণ্ড বাংলা ভাষা নাও থাকতে পারে। তার আশঙ্কা সত্যি হতে চলছে কি?

বাংলাদেশের স্থপতিরা যখন বাংলাভাষীদের জন্য নতুন দেশের লড়াইয়ে নেমেছিলেন তখন তাদের মনে কি ছিল, না জানা গেলেও তারা হয়তো ভেবেছিলেন এটি হয়তো হবে সব বাংলাভাষীর দেশ। কিন্তু তারা হয়তো ভাবতে পারেননি কালে কালে এটি একটি প্রধানতঃ বাঙ্গালী মুসলমানের

AnyScanner

দেশ হয়ে উঠবে। সেখানে একটি ভিন্ন ধরনের ভাষা গড়ে উঠবে এবং তার ফলে দুই বাংলা সংস্কৃতিক ভাবে আরও দূরে চলে যাবে। শুধু রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে দুই বাংলার জোড় টিকে থাকবে না। বাংলাদেশের স্থপতিরা যেটা হয়তো ভাবতে পারেননি। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ তা আন্দাজ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক হওয়া উচিত। কিন্তু দুই বাংলার বাংলা তো এক নয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র ভাষাভিত্তিক হতে হলে সেটি পূর্ববঙ্গীয় বাংলাকে বুনিয়াদ করে হতে হবে। কোনোভাবে ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত বাংলাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশকে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে এই পূর্ববঙ্গীয় বাংলা, যাকে আমরা বাংলাদেশী বাংলা বলেছি তার নব নির্মাণকে এগিয়ে নিতে হবে।

আমাদের জাতি, পরিচয় ও আজাদী রক্ষার জন্য আমেরিকার ইংরেজির পথিকৃৎ নুয়া ওয়েবস্টার অথবা নরওয়ের জাতীয় ভাষা নিন ওরসকের রূপকার আইভার এন্দ্রিয়াস আসেন এর মতো বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষা গড়ে তুলতে হবে। ইংরেজদের মতো সাদা চামড়ার অ্যাংলো সেক্সন প্রোটেসটান্ট হওয়ার পরও যদি আজাদী উত্তর আমেরিকানরা তাদের নিজস্ব ইংরেজি তৈরির তাগিদ অনুভব করতে পারেন তাহলে আমাদের আরও বেশি জাতীয় জরুরতের প্রেক্ষিতে ইসলাম বিরোধী ও জনবিরোধী ফাঁদ থেকে মুক্ত হওয়া কি উচিত নয়?

সংস্কৃতির গরমিলটাই আত্মপরিচয়। মিলটা নয়। ওপার বাংলার সাথে এপার বাংলার পার্থক্যটাই আমাদের জাতি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। বাঙ্গালীত্বের ভাবালুতার আড়ালে সেদিকটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

**বরাত**


১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির ইতিহাস*, কলকাতা (১৯৬০) পৃষ্ঠা ১৭।

২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব কলকাতা* : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২।

৩. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা : অবসর, ২০১০।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বাঙালির উৎপত্তি*, বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, (যোগেশচন্দ্র

[illegible] । কলিকাতা [illegible]

[illegible] সুকুমার সেন সম্পাদিত

কলকাতা [illegible] পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৯ ।

[illegible] সংস্কৃতি । কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

[illegible]

[illegible] সাহিত্য । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০০ ।

[illegible] ইতিহাস প্রথম খণ্ড । কলকাতা : জেনারেল

[illegible] লিমিটেড, ১৯৯৮ ।

[illegible] সম্পর্ক । কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ

[illegible]

[illegible] দ্বিতীয়খণ্ড । কলকাতা : সাহিত্য

[illegible]

[illegible] মালা, পৃষ্ঠা ৯০ ।

উদ্ধৃত [illegible] : বাংলাদেশের রাজনৈতিক

[illegible] ঢাকা : বুক মাস্টার, ২০১৩ ।

[illegible] কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০১১ ।

[illegible] অন্বেষা । ঢাকা : বাংলা একাডেমী,

[illegible]

[illegible] (শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত),

কলকাতা [illegible]

উদ্ধৃত : [illegible] বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড ।

[illegible] সংস্কৃতি । কলকাতা : বুক হাউজ,

[illegible]

[illegible] K. M. Nath, *The Background of Assamese Culture*. Shillong : A. K. Nath, 1948.

[illegible] । কলকাতা : এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স, [illegible]

[illegible] বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, কলকাতা :

[illegible]

[illegible] প্রাগুক্ত

[illegible] রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, সুলভ

[illegible] বিশ্বভারতী [illegible] ১৩৯০, পৃষ্ঠা ৫৮২ ।

[illegible] ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস

লিমিটেড [illegible]

[illegible] একাডেমী ১৯৮২ ।

[illegible] আলি খান, বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা ।

[illegible] মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ । ঢাকা : বাংলা একাডেমি,

১৯৮২ ।

২৮. উদ্ধৃত : Richard M. Eaton, *The Rise of Islam in the Bengal Frontier*, 1204-1760.Delhi:Oxford University Press 1994.

২৯. উদ্ধৃত: Nirad C. Chaudhury, *Thy Hand Great Anarch*, Reading.Mass:Addison -Wesley Publishing Company.

৩০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা ব্যাকরণ* ।

৩১. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* । ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস,

১৯৫৭ ।

৩২. The Rev.William Goldsack, *A Mussulmani Bengali - English Dictionary*. Calcutta : Compiler and Banerjee Press 1923.

৩৩. মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলমানী বাঙ্গালা* ।

৩৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ভাষা প্রেম ও ভাষা বৈরিতা* । দৈনিক প্রথম আলো, ২১

ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ।

৩৫. সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস* : কলকাতা চিরায়ত সংস্করণ ।

৩৬. মুহম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানের তমদ্দুন*, মাসিক মাহে নও, শ্রাবণ, ১৩৬৩ ।

৩৭. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, *বাংলা বানান : তৎসম শব্দ*, সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক,

১৪০৩ ।

৩৮. উদ্ধৃত : সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস* ।

৩৯. প্রাগুক্ত ।

৪০. প্রাগুক্ত ।

৪১. উদ্ধৃত : ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০১০ ।

৪২. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালির রেনেসাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি* । কলকাতা : আনন্দ

পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০২ ।

৪৩. Suniti Kumar Chatterji, *Origin and Development of Bengali Literature*

৪৪. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারত সংস্কৃতি* ।

৪৫. প্রাগুক্ত ।

৩৬. প্রাগুক্ত।
৩৭. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব।
৩৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড।
৩৯. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৭ বৈশাখ ১৩০৯, এপ্রিল ১৯০২), [illegible] (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬১), পৃষ্ঠা ৬২৭।
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '[illegible]', রবীন্দ্র রচনাবলী।
৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '[illegible]', রবীন্দ্র রচনাবলী।
৪২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক। কলকাতা বিশ্বভারতী, [illegible]
৪৩. এ কে [illegible], [illegible]। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: [illegible]
৪৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক।
৪৫. [illegible], '[illegible], বাংলাদেশে', প্রবন্ধ সময়-৮। কলকাতা [illegible] প্রা: লি: [illegible]
৪৬. প্রাগুক্ত
৪৭. এস ওয়াজেদ আলী, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মুসলমান।
৪৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের ভাষা সমস্যা।
৪৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সীতার বনবাস।
৫০. The Linguistic Survey of India. *Journal of the Asiatic society.*
৫১. [illegible], 'বাংলা গদ্যের হাত বদল', সাহিত্য ও সাহিত্যিক, কলকাতা [illegible]
৫২. প্রমথ চৌধুরী, বঙ্গ ভাষা বনাম বাবু বাংলা ও সাধু বাংলা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা [illegible]
৫৩. প্রমথ চৌধুরী, 'বাংলা ভাষার কুলের খবর', প্রাগুক্ত।
৫৪. মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৯৫০।
৫৫. W. W. Hunter, *Indian Mussalman.*
৫৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা।
৫৭. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩।
৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. [illegible], বৈশাখ ১৩২১। উদ্ধৃত : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙালীর জাতীয়তাবাদ।
৬০. সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৩৭), দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর অভিভাষণ। উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ভাষা প্রেম ও ভাষা বৈরিতা।
৬১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতি কথা। ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৯৬।
৬২. বঙ্গদর্শন ১২৮০। উদ্ধৃত : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙালীর জাতীয়তাবাদ।
৬৩. হিতকরী ১৫ নভেম্বর ১৮৯০, উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত।
৬৪. হিতকরী জুন ১৮৯১, উদ্ধৃত : প্রাগুক্ত।
৬৫. উদ্ধৃত : পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য (সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত), ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮।
৬৬. মোতাহের আলী চৌধুরী, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য', অপ্রকাশিত রচনা (আনিসুর রহমান সম্পাদিত), ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।
৬৭. তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ। মাতৃভাষা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৫, মাওলানা আকরম খাঁ।
৬৮. *Selection from The Mussalman'*. 1906-1908 (ed.Bhuiyan iqbal) Calcutta .1994
৬৯. Bengal Legislative Council Proceedings. 1926.
৭০. Report of the Calcutta University Commission, 1919 vol X
৭১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।
৭২. হুমায়ুন কবির, 'বাংলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, (মুস্তফা নূর উল ইসলাম সম্পাদিত), ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স ১৯৯০।
৭৩. দীনেশ রায়, ডাক পুরুষের ডাক।
৭৪. শিবনারায়ণ রায়, আধুনিক বাংলা কবিতা ও জসীম উদ্দিন-প্রসঙ্গ নক্সী কাঁথার মাঠ, ভারত বিচিত্রা (ঢাকা), ডিসেম্বর ২০০৩।
৭৫. উদ্ধৃত : জাহিরুল হাসান, বাংলায় মুসলমানের আটশ বছর, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১২।
৭৬. উদ্ধৃত : পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য (সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত)
৭৭. প্রাগুক্ত।
৭৮. প্রাগুক্ত।
৭৯. প্রাগুক্ত।
৮০. প্রাগুক্ত।
৮১. প্রাগুক্ত।
৮২. প্রাগুক্ত।
৮৩. প্রাগুক্ত।

AnyScanner

৯৪. প্রাগুক্ত।

৯৫. Syed Sajjad husain, The Wastes of Time. Dhaka : Notun Safar Prokashani, 1995.

৯৬. উদ্ধৃত : *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*।

৯৭. প্রাগুক্ত।

৯৮. এম এ মোহাইমেন, ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভক্তি ও কায়েদে আযম জিন্নাহ। ঢাকা : পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪।

৯৯. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮।

১০০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ভারতের একজাতি গঠন*, বুলবুল, কার্তিক, ১৩৪৪।

১০১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৮৭।

১০২. শেখ দরবার আলম, *সংস্কৃতি ও সহাবস্থান*। ঢাকা : শাহীন পাবলিকেশন্স, ২০০৬।

১০৩. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১২।